বাংলা নামে দেশ

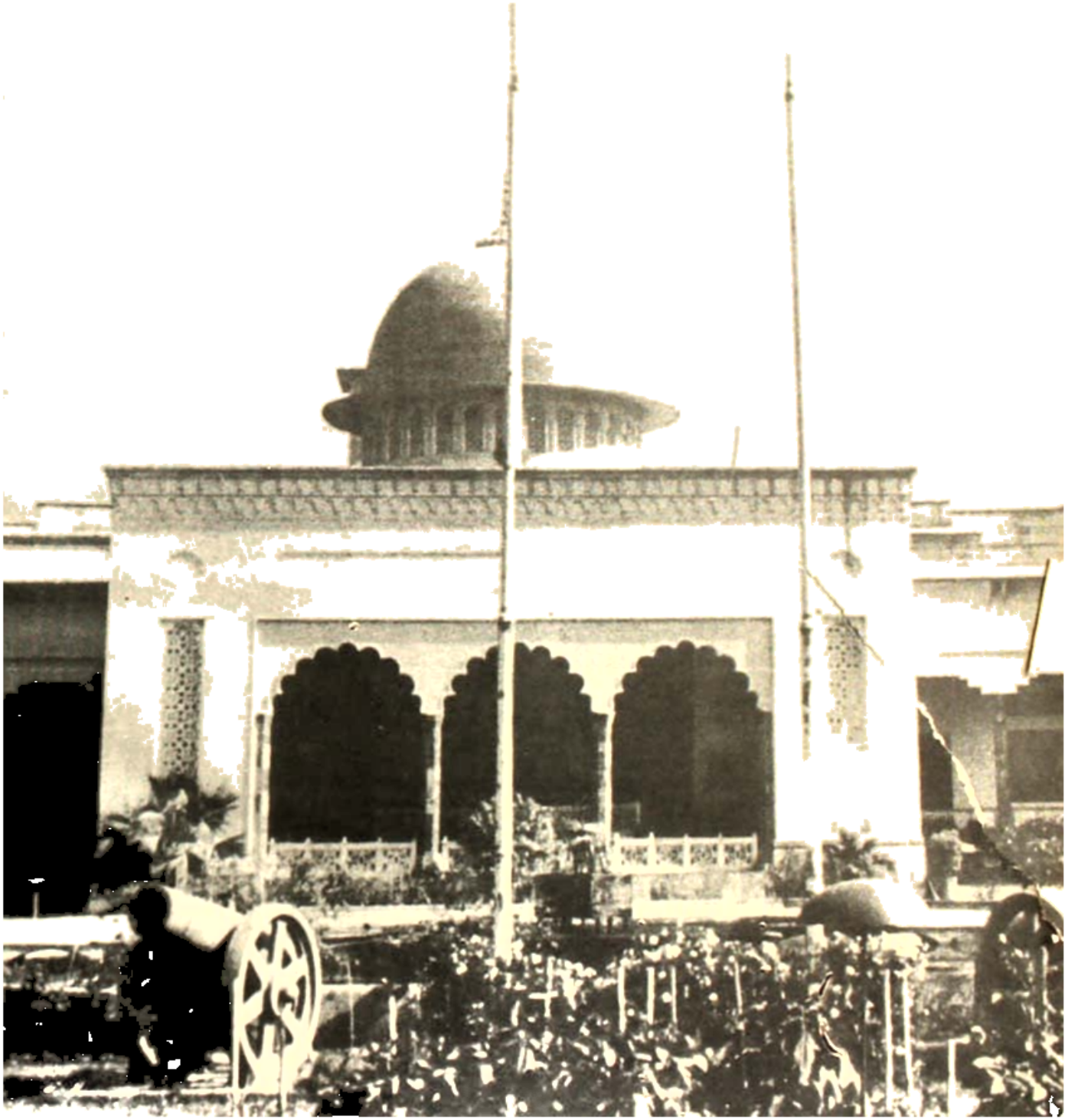

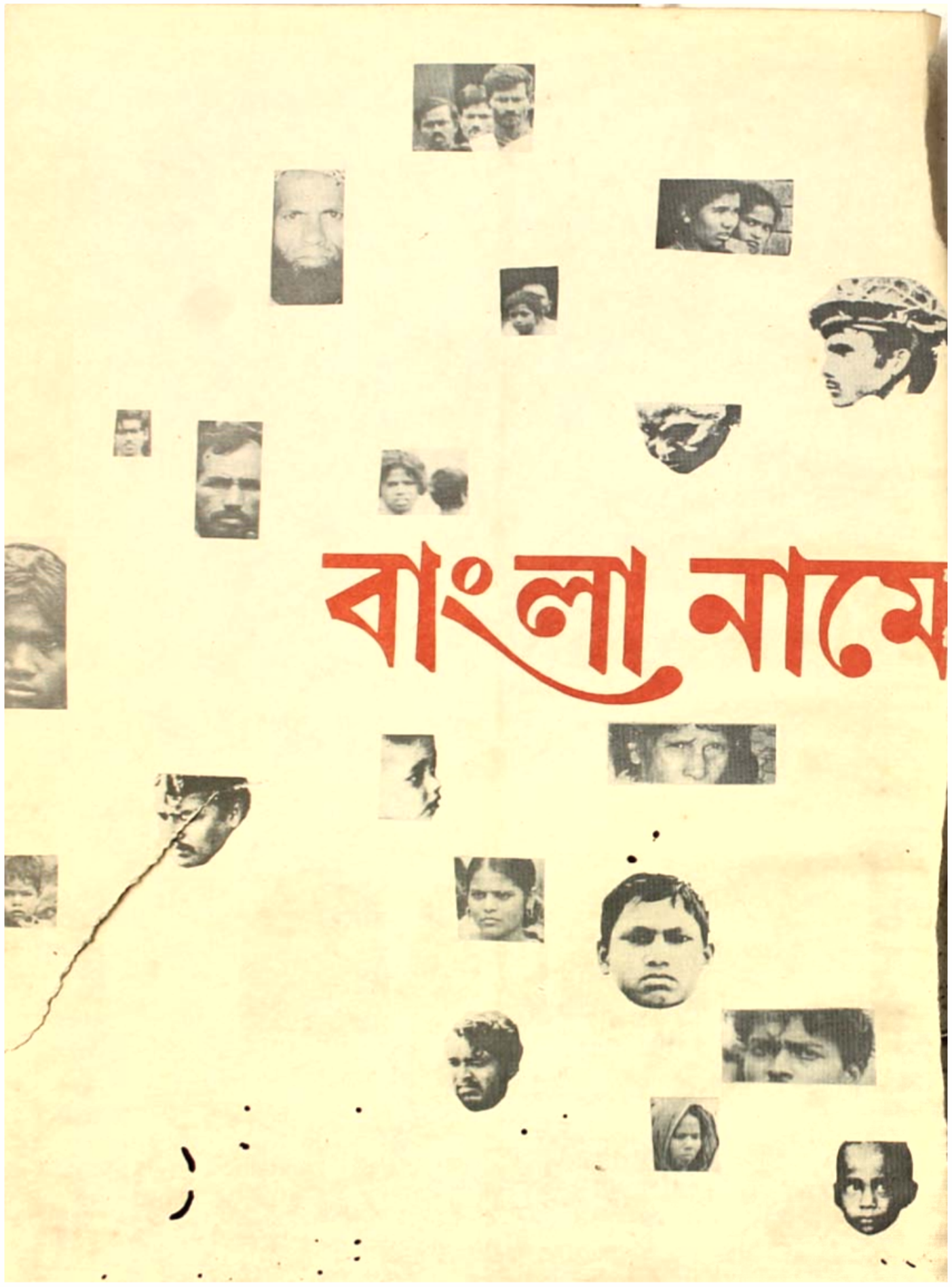
বাংলা নামে

দেশ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

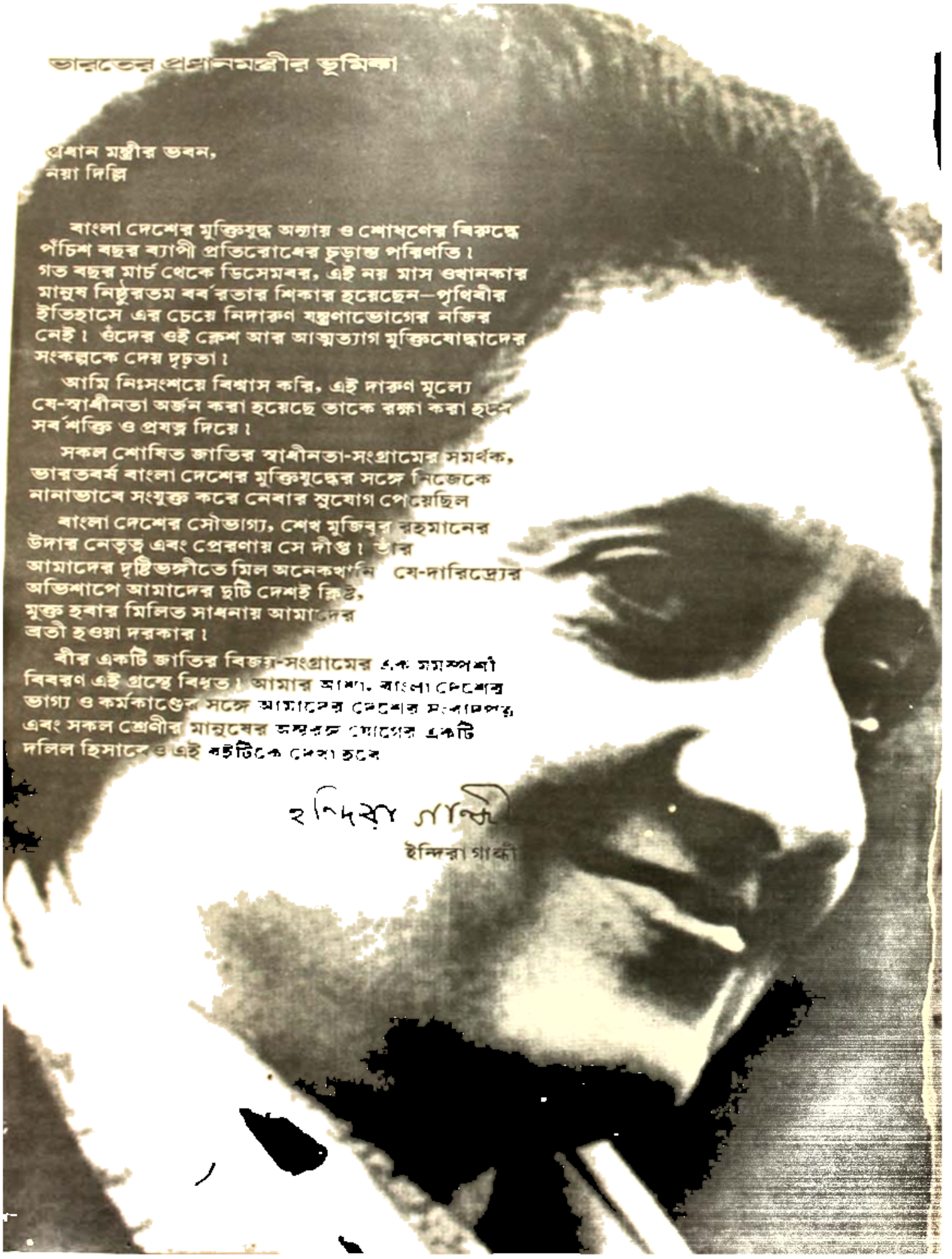

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

প্রধান মন্ত্রীর ভবন,
নয়া দিল্লি

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে পঁচিশ বছর ব্যাপী প্রতিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি। গত বছর মার্চ থেকে ডিসেম্বর, এই নয় মাস ওখানকার মানুষ নিষ্ঠুরতম বর্বরতার শিকার হয়েছেন—পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে নিদারুণ যন্ত্রণাভোগের নজির নেই। ওঁদের ওই ক্লেশ আর আত্মত্যাগ মুক্তিযোদ্ধাদের সংকল্পকে দেয় দৃঢ়তা।

আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি, এই দারুণ মূল্যে যে-স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছে তাকে রক্ষা করা হবে সর্বশক্তি ও প্রযত্ন দিয়ে।

সকল শোষিত জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থক, ভারতবর্ষ বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে নানাভাবে সংযুক্ত করে নেবার সুযোগ পেয়েছিল

বাংলা দেশের সৌভাগ্য, শেখ মুজিবুর রহমানের উদার নেতৃত্ব এবং প্রেরণায় সে দীপ্ত। তাঁর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে মিল অনেকখানি যে-দারিদ্র্যের অভিশাপে আমাদের দুটি দেশই ক্লিষ্ট, মুক্ত হবার মিলিত সাধনায় আমাদের ব্রতী হওয়া দরকার।

বীর একটি জাতির বিজয়-সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ এই গ্রন্থে বিধৃত। আমার আশা, বাংলা দেশের ভাগ্য ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের সংযোগের এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরঙ্গ যোগের একটি দলিল হিসাবেও এই বইটিকে দেখা হবে

ইন্দিরা গান্ধী

ইন্দিরা গান্ধী

PRIME MINISTER'S HOUSE
NEW DELHI

Bangladesh's final battle for freedom was the culmination of twenty-five years of resistance to exploitation and injustice. From March to December last year, the people were subjected to the cruellest savagery and the most intense suffering the world has known. This very sacrifice strengthened the will of the fighters for liberation.

I have no doubt that the freedom which has been so dearly bought will be defended as jealously.

India, which has supported the freedom movements of all exploited people, was privileged to identify herself in many ways with the struggle of Bangladesh.

Bangladesh has the good fortune to have the inspiration and enlightened leadership of Sheikh Mujibur Rahman. There is so much that is similar between his vision and ours. We should now strive together to remove the curse of poverty which afflicts both of us.

This book is a moving account of the victorious struggle of a heroic people. I hope it will also be seen as a record of the intense involvement of our press and all sections of our people in the cause of Bangladesh.

Indira Gandhi

(Indira Gandhi)

New Delhi,
March 27, 1972

বাংলাদেশের
প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

রচনা
অমিতাভ চৌধুরী
আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরী
কৃপাময় পণ্ডিত
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বরুণ সেনগুপ্ত
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
আলোকচিত্র
অজিত সোম
অতীন্দ্র সরকার
অরূপকুমার সরকার
অলোক মিত্র
অশোক বসু
আবদুল বারি
চন্দন দত্ত
তারাপদ ব্যানার্জী
পাহাড়ী রায়চৌধুরী
বিজন ব্যানার্জী
বিমল ব্যানার্জী
বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত
বীরেন্দ্রনাথ সিংহ
রণজিৎ রায়
রামেচন্দ্র শর্মা
সত্যেন সেন
হীরেন সিংহ

সম্পাদনা ॥ অতীন্দ্র সরকার
পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা
শুর্বেন্দু পত্রী
মানচিত্র
অর্ধেন্দু দত্ত

এই বইয়ের ভাষা ও আলোকচিত্রের
সম্পূর্ণ বা আংশবিশেষ প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে প্রকাশ নিষিদ্ধ।

প্রকাশক : শ্রীকমিলুদ্দিন সেখ
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীকমিলুদ্দিন সেখ
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস
প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
এপ্রিল ১৯৭৩
মূল্য : দশ টাকা

বাংলা নামে দেশ।
তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর।
মা গঙ্গা মতে নেমে নিজের মাটিতে
সেই দেশ গড়লেন।

বাংলার লক্ষ্মী বাংলাদেশ জুড়ে বসলেন।
মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে
লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন।
ফলে ফুলে দেশ আলো হল।
সরোবরে শতদল ফুটে উঠল।

লোকের গোলা ভরা ধান
গোয়াল ভরা গরু
গাল ভরা হাসি।
লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। ১৯০৫

বাংলা নামে দেশ

পশ্চিমের অত্যাচার পূর্বের প্রতিরোধ

অবিচার ছিল। তার থেকে জন্ম নিয়েছে অসন্তোষ। অত্যাচার ছিল। তার থেকে জন্ম নিয়েছে আন্দোলন। সেই আন্দোলনকে দমন করবার জন্য দিনে-দিনে কিংবদন্তি থেকে কিংবদন্তির হয়ে উঠেছিল পাক-ফৌজবাহিনী। গ্রাম পুড়িয়ে, শহর পুড়িয়ে, লক্ষ-লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে পাকিস্তানের পূর্বখণ্ডে যে বাসক বীভৎসতা তারা জাগিয়ে তুলেছিল, নাৎসী নারকীয়তাকেও তা লজ্জা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যা বরাবরই একটি ঔপনিবেশ মাত্র, সেই পূর্বখণ্ডকে একটি বিশাল বন্দী-শিবিরে পরিণত করে সেখানকার জাগ্রত জনমতকে তারা পিষে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। আন্দোলন থামেনি। বরং দিনে-দিনে পরিধি আরও বড় হয়েছে, চরিত্র আরও সুস্পষ্ট। আন্দোলন রূপান্তরিত হয়েছে সংগ্রামে। আত্মপ্রতিষ্ঠার সেই সংগ্রাম আজ সফল। পূর্ব-পাকিস্তানের শবদেহ থেকে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। তার আকাশে উড়ছে হরিৎ-লোহিত-স্বর্ণবর্ণ পতাকা। অবিচার-অসন্তোষ-আন্দোলন-নিপীড়ন-সংগ্রাম-স্বাধীনতার এই যে আশ্চর্য কাহিনী, এর সূত্র কবে কোথা থেকে? আটচল্লিশের সেই উত্তাল দিনটি থেকে, জিন্না-সাহেবের মুখ উপরে বাঙালী ছেলেরা যেদিন স্পষ্ট বলেছিল, "আমরা উর্দু চাই না, বাংলা চাই"? নাকি চুয়ান্নর সেই দীপ্ত দিবস থেকে, নির্বাচনী যুদ্ধে মুসলিম লীগকে চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিয়ে এবং তার সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে বাংলার মাটিতে কবর দিয়ে এক জাগ্রত জনসমাজ যে-দিন ওই পূর্বখণ্ড বুকে দাঁড়িয়েছিল? আমরা কি সেই অভাবিত সাফল্যের নায়ক শের-এ-বাংলা ফজলুল হকের উপরে আলো ফেলে শুরু করব এই ধারাবিবরণী? নাকি আলো ফেলব তাঁর সেদিনকার সেই মন্ত্রিসভার কনিষ্ঠ সদস্যের উপর—নাম যাঁর শেখ মুজিবুর রহমান?

একেবারে সূত্রের থেকেই শুরু করা যাক।
১৯৪৭ সনের আগস্টে জন্ম নিল দুই স্বাধীন রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক যে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপরে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, সেই তত্ত্বেরই যে কোনও ভিত্তি নেই, পাকিস্তানের পূর্বখণ্ডের মানুষের সে-কথা বুঝতে বিশেষ দেরি হয়নি। অচিরে তারা বুঝতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন সৃষ্টি, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন স্বার্থের মানবগোষ্ঠীকে যদি শুধু ধর্মীয় ঐক্যের রজ্জুতে

যেখানে এক-রাষ্ট্রের পতাকাতলে সাহত করা সম্ভব হত, খণ্ডিত ইউরোপে তবে পৃথক-পৃথক এতগুলি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঘটত না, এবং মুসলিম দেশগুলোও তবে অনেক পতাকার বদলে মাত্র একটিই রাষ্ট্রীয় পতাকা উড়ত।

এই উপলব্ধিকে ধ্বংসাত্মক করেছিল পাকিস্তান-গোষ্ঠীরই অবিচার ও অত্যাচার। মুখে তারা মুসলিম ঐক্যের কথা বলতেন, কিন্তু কার্যত যে-সব ব্যবস্থা তারা নিচ্ছিলেন, তাতে প্রথমাবধিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, পূর্বখণ্ডকে শোষণ করে পশ্চিমখণ্ডের সমৃদ্ধিসাধনই তাঁদের লক্ষ্য। বাঙালী মুসলিমদের সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘৃণার ভাবও গোপন থাকেনি। ১৯৫২ সনেই ফিরোজ খাঁ নূন বলেছিলেন, এরা আধা-মুসলিম। (পরে আয়ুব খাঁর আত্মজীবনীতেও এই ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখতে পাই। "বেঁটে ও কুচ্ছিত" বাঙালীদের উদ্দেশে তিনি সেখানে বাঙ্গ-বিদ্রূপের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন।) তা ছাড়া, পূর্ববঙ্গের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কোনও দিনই পাক-সামন্তগোষ্ঠীর কাছে সেই গুরুত্ব ও মর্যাদা পায়নি, আপন অধিকারেই যা তার প্রাপ্য ছিল। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাঙালী জনসমাজের নিজস্ব যে একটি জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে, পশ্চিমী প্রভুরা তাকে সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে পূর্বখণ্ডের মানুষদের বস্তুত এক নামহীন পরিচয়হীন নকলনবিস দাসের স্তরে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আয়ুব খাঁর আত্মজীবনীর নাম 'ফ্রেন্ডস্, নট মাস্টার্স'। কিন্তু অনায়াসেই ওই বইয়ের নাম হতে পারত 'মাস্টার্স অ্যান্ড স্লেভ্স্'। শুধু তিনি কেন, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাক-কর্তাদের কেউই কখনও বাঙালীদের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্য ছাড়া অন্য কোনও সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভাবেননি।

ভাষা উচ্চারণ করছে। রাজপথে মিছিল। হাজার হাজার মানুষ, সকলের চোখে মুখে প্রতিবাদের উত্তাপ। ঢাকার রাজপথে মুহূর্তে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, মেডিকেলের সামনে, মুহূর্তে, অন্যান্য বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করার সময়

ভাষা আঘাত হানল। ১৯৪৮ সনের ২১শে মার্চ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বয়স তখন সবে সাত মাস পেরিয়েছে। নবলব্ধ স্বাধীনতার উদ্দীপনা তখন পূর্বখণ্ডেও কিছু কম নয় এবং জিন্না নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, সেই উদ্দীপনার জোয়ারের মধ্যেই তাঁর ভাষাগত

বক্তৃতারত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ। সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার প্রতিধ্বনিমুখর তোফায়েলের কণ্ঠে ঘোষিত হল, চাই স্বাধীন শাসন, চাই রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি। চাই না আয়ুবশাহীর সাথে এক কিন্তু আপস।

চক্রান্তকে তিনি সফল করে নিতে পারবেন। কার্যত কিন্তু তা পারে গেল না। উর্দু শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের ভাষা, জিন্না সেদিন ঢাকার এক-ধারা ঘোষণা করেছিলেন সেখানকার ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ জানাল। 'জাতির পিতার মুখের উপরে এঁরা শুনিয়ে দিল, বাংলা ভাষাকেও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

জিন্নার বোঝা উচিত ছিল, যা তাদের অশেষ গর্বের বস্তু, সেই ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরে কোনও আক্রমণই বাঙালী জনসমাজ সহ্য করবে না। কিন্তু জিন্না সে-কথা বোঝেননি। তাঁর পরবর্তী শাসকেরাই বা বুঝলেন কই? কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও নানা ফন্দিফিকিরের জাল বিছিয়ে তাঁরাও চেষ্টা করতে লাগলেন পূর্বখণ্ডের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিভিত্তিক স্বতন্ত্র সত্তাকে মুছে ফেলতে। বাংলা লিপির বদলে আরবী লিপির প্রবর্তনের জন্য পূর্বখণ্ডে কুড়িটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, বাংলা ভাষাকে, অন্তত চেহারায়, উর্দু করে দেওয়া।

চক্রান্ত সফল হয়নি। যেমন উর্দুকে, তেমনি বাংলাকেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন পশ্চিমী প্রভুরা। গোটা পূর্বখণ্ড জুড়ে দেখা দিয়েছিল ভাষা-আন্দোলন। বুকের রক্ত ঢেলে মুখের ভাষার অধিকার রক্ষা করবার জন্য দলে-দলে এগিয়ে এসেছিলেন ছাত্র ও যুবসমাজ। পাকিস্তানের শাসক-চক্র সেই অভূতপূর্ব আন্দোলনের সামনে নতিস্বীকারে বাধ্য হলেন। কিন্তু তার আগে, আন্দোলন দমনের জন্য, যে কী হিংস্র চেহারার তারা দেখা দিয়েছিলেন, তা কারও অজানা নয়।

১৯৫১ সনের ৯ এপ্রিল তারিখে গোটা পূর্বখণ্ড জুড়ে ঊর্ধ্বায়িত হয়েছিল 'জাতীয় ভাষা দিবস'। দাবি করা হয়েছিল, বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করা হোক। দাবি আদায়ের জন্য শুরু হয়েছিল আন্দোলন। তার তীব্রতা দিনে-দিনে বাড়তে থাকে। শহরে-গঞ্জে-গ্রামাঞ্চলে তার তরঙ্গ দিনে-দিনে ছড়িয়ে ছেটে থাকে। সমান্তরালে চলছিল ধরপাকড়।

নিছক দিনে-দিনে বাড়ছিল। কিন্তু আন্দোলন তবু থামেনি। বরং, শাসকচক্রের বাঁধন যতই শক্ত হচ্ছিল, ততই দুর্জয় হয়ে উঠছিল পূর্ববঙ্গের প্রতিজ্ঞা।

একটা মাস পরের কথা। ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারি। আন্দোলনের জোয়ারে সারা পূর্ববঙ্গ তখন টলমল, উত্তাল। ঢাকার রাস্তায় সুদীর্ঘ এক মিছিল বার হলেন। একুশ তারিখে গুলি চলল তাঁদের উপরে। কিন্তু ছাত্র ও যুবসমাজ তবু অটল। গুলি চলেছিল বাইশ তারিখেও। ঢাকার রাজপথ বয়ে গেছে গিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন তবু স্তব্ধ হয়নি। নতুন রাতের নতুন তাজা প্রাণকে নিমেষে নিভিয়ে দিয়েছিল পাক-শাসকদের বন্দুক। কিন্তু বন্দুকাঘা সম্পর্কে বাঙালী জনসমাজের মনোভাবকে তবু গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়নি। পূর্ববঙ্গের মানুষের বুকে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটি অক্ষয় অক্ষরে আজও ফুটে আছে। চিরকাল থাকবে।

পূর্ব বাংলার জনজীবনে ভাষা-আন্দোলনের সবচাইতে বড় দান এই যে, পশ্চিমী শাসকচক্রের সর্বাত্মক স্বরূপকে তা সার্বিকভাবেই বাঙালী জনসাধারণের চোখে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। অত্যাচার তো শুধু ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চলছিল না, চলছিল সর্বক্ষেত্রেই। যেমন সাংস্কৃতিক, তেমনি সামাজিক আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে কখনও পশ্চিমের কাছে সুবিচার পায়নি। বাহান্ন সনের নিদারুণ পরে সেই

সর্বাত্মক অবিচারের চেহারাটা আরও স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষের চোখে ধরা পড়ে যায়। ফলে, তখন থেকেই অটোনমির দাবি ক্রমে প্রবল হতে থাকে। বাঙালীরা বুঝতে পারেন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না-পাওয়া পর্যন্ত সার্বিক এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

পরবর্তী ইতিহাস মুসলিম লীগের বিপর্যয়ের ইতিহাস। পূর্ব বাংলায় যাঁরা মুসলিম লীগের কর্তাব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই ভূমিকা বস্তুত তল্পিবাহীর ভূমিকা। যে রাজনীতি তাঁরা করতেন, পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের পথ পরিষ্কার করা ছাড়া তার আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তাঁরা উৎখাত হয়ে গেলেন। লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন বিভিন্ন দলের যুক্ত ফ্রন্ট। প্রাদেশিক বিধানসভার ৩০৯টি আসনের মধ্যে ফ্রন্ট পেলেন ২১৫টি আসন। অর্থাৎ মোট আসন-সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী এল ফ্রন্টের দখলে।

কিন্তু এই বিপুল পরিস্ফীতা সত্ত্বেও ফ্রন্ট-সরকার দীর্ঘায়ু হতে পারেননি। ৩ এপ্রিল তারিখে

ধর্মীয় রাজনীতিক ফজলুল হকের নেতৃত্বে ফ্রন্ট-মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলেন, তারপর মাত্র দু' মাস পার না হতেই, ৩০ মে তারিখে, সেই মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে দেওয়া হল।
হক সাহেব ইতিহাসে একবারের এসে ঘোষণা করেছিলেন যে, দুই বাংলার মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর খাড়া করে রাখা হয়েছে, তা তিনি চূর্ণ করবেন। শুনে, পাক-কর্তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কেননা, পাঁচিলটা তাঁরাই তুলেছিলেন; দুই বাংলার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক লেন-দেন বন্ধ হবার দায়িত্ব তাঁদেরই। তল্পিবাহী লীগের পরাজয়ে এমনিতেই তাঁরা তখন নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে আছেন, এমন সময়ে হকের এই ঘোষণায় তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, ফ্রন্ট-মন্ত্রিসভাকে আর টিকতে দেওয়া হবে না।
হক-সরকারকে পদচ্যুত করবার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, পূর্ববঙ্গে তাঁরা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেননি। কিন্তু কে না জানে, অশান্তি আর উচ্ছৃঙ্খলার আগুনে জ্বালিয়েছিলেন স্বয়ং পাক-কর্তারাই। ফ্রন্ট-মন্ত্রিসভাকে খারিজ করবার অনুষ্ঠাত সৃষ্টির জন্য পাক-কর্তৃদের ইন্ধনেই যে সেদিন নারায়ণগঞ্জের অভাবনীয় ছুট হিসে দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল, তা কে না জানে।
শুধু প্রাদেশিক একটি মন্ত্রিসভাকে খারিজ করেই পশ্চিমী প্রভুরা সেদিন ক্ষান্ত হননি। হক-সাহেবকে তাঁরা গৃহবন্দী করে রাখলেন। সেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠালেন জেলখানায়। আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যে পক্ষ, সরকারকে গদিতে বসানো হল, তাদের দিক থেকে কার্যকর কোনও বাধা আসবার প্রশ্নই ছিল না। পশ্চিমী প্রভুর ও দেশের অভাবের মতই অবাধে চলতে লাগল।
হক-সাহেবের দুস্থ শাসনের আমলেই অবশ্য বাঙালীদের একটা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। দুঃখের সঙ্গে ও ভয়ে তাকিয়ে পাক শাসক-পরিষদ এই শ্রেণীর একটি প্রস্তাব পাশ করতে বাধ্য হয় যে, বাংলা ও উর্দু দুই-ই হবে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা।
দুঃখের থেকে আটচল্লিশ, এই কয়েকটা বছরে যেমন পূর্ববাংলার প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায়, তেমনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাতেও ঘোর অস্থির অবস্থা চলতে থাকে।

বাগদাদ সনে সুরাবর্দী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সাতান্ন সনে তাঁকে বিদায় নিতে হল। এলেন ফিরোজ খাঁ নূন। কিন্তু তিনও বেশীদিন গদিতে থাকতে পারেননি। আটান্নর ৭ অক্টোবর তারিখে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা সামরিক বাহিনী তলব করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিও পদচ্যুত হল। জোড়া দেওয়া হল সামরিক আইন। এই আটান্ন সনেই পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা পুরোপুরি কৌজী নায়কদের হাতে চলে যায়। মির্জাকে তাড়িয়ে জেনারেল আয়ুব খাঁ হন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।
পাক রাজনীতিতে যে ইতিহাস অনেক নোংরামি ঢুকেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এবং সত্যের খাতিরে স্বীকার করা ভাল—শুরুতে প্রথম দিকে এমন একটা আশা অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল যে, আয়ুব হয়ত দেশের শাসন-কাঠামোকে সেই নোংরামি থেকে কিছুটা মুক্ত করতে পারবেন। কার্যত দেখা গেল, সেটা নেহাতই দুরাশা। প্রথম-প্রথম দু-চারজন চোরাকারবারীকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে বোঝা গেল, সামরিক শাসন এমন কোনও সমস্যা নয়, যাতে সর্বরোগের উপশম হওয়া সম্ভব।
শাসন-যন্ত্রে দুর্নীতি যেমন্তুত দিনে-দিনে আরও বাড়তে লাগল। পাকিস্তানী ইনডাস্ট্রিয়ের দ্রুত সমৃদ্ধির নেপথ্য-ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরাই বলবেন, আয়ুব শুধু তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কায়েম করছিলেন, তাঁর পুত্রের ঘুনাফা বাড়াবার জন্য। অন্য দিকে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ইতিহাস কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কারও যা করবার উপায় ছিল না। আয়ুব অবশ্য বেসিক ডিমোক্রেসি বা মূলনিয়মী গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত বস্তু ইতিহাস চালু করেছিলেন। কিন্তু তার চেহারা দেখেই টের পাওয়া গিয়েছিল যে, গণতন্ত্র বলতে লোকে যা বোঝে, তার সঙ্গে এই বস্তুটির কোনও সুদূরতম সম্পর্কও নেই। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র অনিয়ন্ত্রিত ভণ্ডামির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। উপরন্তু দেখা গেল, পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে আয়ুবও সেই চিরাচরিত শোষণের নীতিই চালাচ্ছেন। দশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন আয়ুব। জৌলী শাসন-চক্র এই দশ বছরকে ডিকেড অব ডেভেলাপমেন্ট আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কেন, এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল কার? রাষ্ট্র ছিলেন সমগ্র পাকিস্তানের? নাকি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের কুখ্যাত সেই বাইশটি পরিবারের, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা যাদের মুঠোর মধ্যে ইতিমধ্যে চলে এসেছিল? পাকিস্তানের মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা আশি ভাগই আয়ুবের আমলে

এই বাইশটি পরিবারের দখলে চলে আসে। বলা বাহুল্য, দেশের পশ্চিমাংশের সমৃদ্ধি ইতিমধ্যে কম ঘটেনি। কিন্তু তার মূল্য দিতে হয়েছে প্রধানত পূর্বাংশকে। বাঙালী জনসমাজকে বঞ্চিত রেখে, আর শোষণ করে পশ্চিমী প্রভুরা আরও ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন।

শুধু তা-ই নয়, সংবিধানে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সংবিধান ইতিমধ্যে বাতিল হওয়ায় বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ পুনশ্চ অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াল। আয়ুবের উক্তি সেই অনিশ্চয়তাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের হাটে 'বেসিক ডিমোক্রেসি'কে বিকোতে এসে ভাষার প্রশ্নে আয়ুব যখন বলেছিলেন, "সারি জবান্ মিলিজুলি কর্ এক জবান্ বানা চাহিয়ে; উয়ো উর্দু নেহি, উয়ো বংলা ভি নেহি, উয়ো পাকিস্তানী জবান্" বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তখন এই ভেবে আতঙ্ক বোধ করেছিলেন যে, অশিক্ষিত ফৌজী জমানার অত্যাচারে বঙ্গভাষার নাভিশ্বাস উঠতে অতঃপর দেরি হবে না। ক্ষমতার গদিতে আয়ুবও অবশ্য টিকে থাকতে পারেননি। পঁয়ষট্টিতে তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় জিগির তুলেও পূর্বখণ্ডকে যে তিনি আর ভোলাতে পারেননি, তার কারণ, সেখানকার মানুষদের চোখ ইতিমধ্যে খুলে গিয়েছিল। আটষট্টিতে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে পুরেছিলেন, কিন্তু 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' সাজিয়েই বা বাঙালীদের তিনি ধোঁকা দিতে পারলেন কই? জনসাধারণ তার অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, কে তাঁদের শত্রু, আর কে তাঁদের প্রকৃত বান্ধব। ফৌজী শাসনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। আয়ুব তার ফলে ১৯৬৯ সনের ১ জানুয়ারি তারিখে সাজানো-মামলা প্রত্যাহার করে মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ওদিকে, যেমন পূর্ববঙ্গে, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন দিনে-দিনে উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে। আন্দোলনের লক্ষ্য : গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। লাঠি আর বন্দুক চালিয়ে তাকে রোখা গেল না। বিক্ষুব্ধ জনতরঙ্গে আয়ুবশাহি ভেসে গেল।

কিন্তু ফৌজী শাসনের তবু অবসান ঘটল না। আয়ুব গেলেন। এলেন আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ। ইয়াহিয়া সম্পর্কে প্রথম-প্রথম এই রকমের একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা চলছিল যে, তিনি অনিচ্ছুক স্বৈরশাসক, ফৌজী শাসনকে জিইয়ে রাখতে চান না, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান। ১৯৬৯ সনের ২৫ মার্চ তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন; তার আট মাস বাদে, ২৮ নভেম্বর, তিনি ঘোষণা করলেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, নির্বাচন হবে সত্তর সনের ৫ অকটোবর তারিখে। পরে, সেটাকে আরও দু' মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়। ৭ ডিসেমবর নির্বাচনের দিন বলে ধার্য হল।

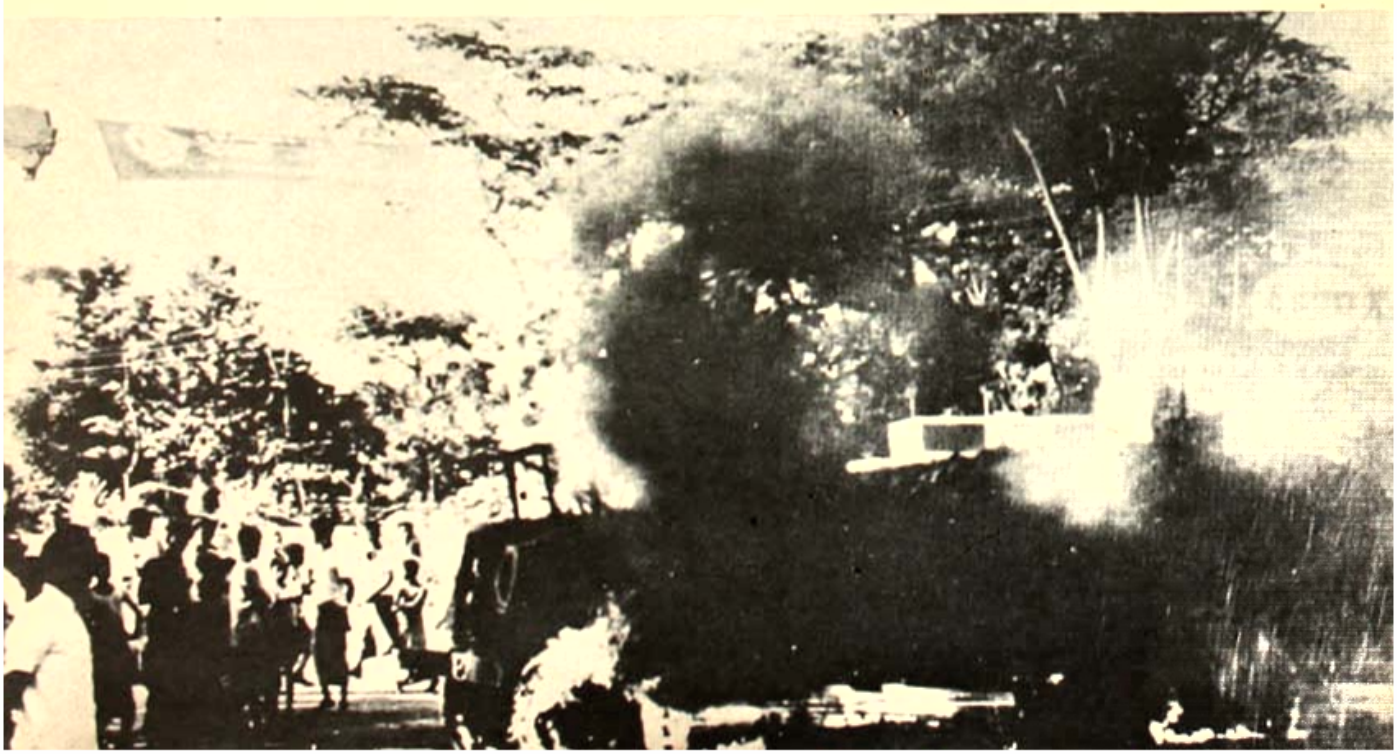

মিউনিসপ্যালিটির গাড়ী জ্বলছে ঢাকার রাস্তায়, জনতার রাগের আগুনে। পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচারের প্রতিবাদে পথে পথে জনতার পাল্টা আক্রমণ, সংঘবদ্ধ পাহারা।

ঢাকা থেকে কার্যালয় ৮২ মাইল পথ, টাঙ্গাইলে যাত্রা-বিরতি, শহরে ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার, পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছাত্র-সমাবেশ। ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় লড়াইয়ের প্রস্তুতির আগে এখানে যেন যেতে যেতে প্রস্তুতিপর্ব।

নির্বাচনের প্রসঙ্গে যাবার আগে গোটাকয় কথা বলে নেওয়া দরকার।

সবচাইতে জরুরী কথাটা এই যে, পশ্চিমী শাসকবর্গের মনোভাব সম্পর্কে পূর্বাঞ্চলের ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ মোহমুক্তি ঘটেছিল। বাঙালী জনসমাজ স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন, পশ্চিমের কাছে একমাত্র বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই তাঁদের জোটেনি। একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বছরের পর বছর তাঁরা অত্যাচারিত হয়েছেন, এবং সামাজিক সুবিচার আদৌ পাননি, অন্যদিকে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—তেমনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা শোষকশ্রেণীর শিকার হয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে তাঁদের লাভ বই লোকসান নেই, কিন্তু পশ্চিমী শাসকরা সেই সম্পর্ক তাঁদের কোনদিনই গড়ে তুলতে দেবেন না। তাঁরা বেশী দরে কিনে পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য কিনতে বাধ্য হবেন, কিন্তু অন্য কোনও সূত্রে স্বল্পমূল্যে তা সংগ্রহ করতে পারবেন না। তাঁদের শিল্পায়ন ধরাবর উপেক্ষিত থাকবে; বছরের পর বছর তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানকে শুধু কাঁচামাল যুগিয়ে যাবেন মাত্র। অথচ, জনসংখ্যায় তাঁরাই পাকিস্তানের গরিষ্ঠ অংশ, তাঁদেরই চা আর পাট বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয়, আর তাঁদেরই শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠছে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি। সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, কখনও চোখ রাঙিয়ে আর কখনও চোখ রাঙিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের বাগিয়ে রেখে, নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে যাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী যে-কোনও দেশ তার উপনিবেশকে যেভাবে শোষণ করে, ঠিক সেইভাবেই পূর্বখণ্ডকে ব্যবহার শোষণ করেছে পশ্চিমখণ্ড। মোটা পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বাইরে থেকে যে সাহায্য এসেছে, তারও সিংহ-ভাগ দখল করেছে পশ্চিম-পাকিস্তান, পূর্বাংশে

উপরে
মেজর শফিউল্লাহ ও ক্যাপ্টেন হায়দার মিলিটারির কনভয়।

নীচে
বেলজিয়াম বিমানেই এসেছে এসে থামিয়ে দিয়েছেন ঢাকাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পরে সৈন্য নিয়ে বিমানের বিরুদ্ধে সাবোটাজ করেন।

পাশের পাতায়
মেজর জলিলের নেতৃত্বে ৪৪ বালুচ তৈরী করছে অবস্থান।

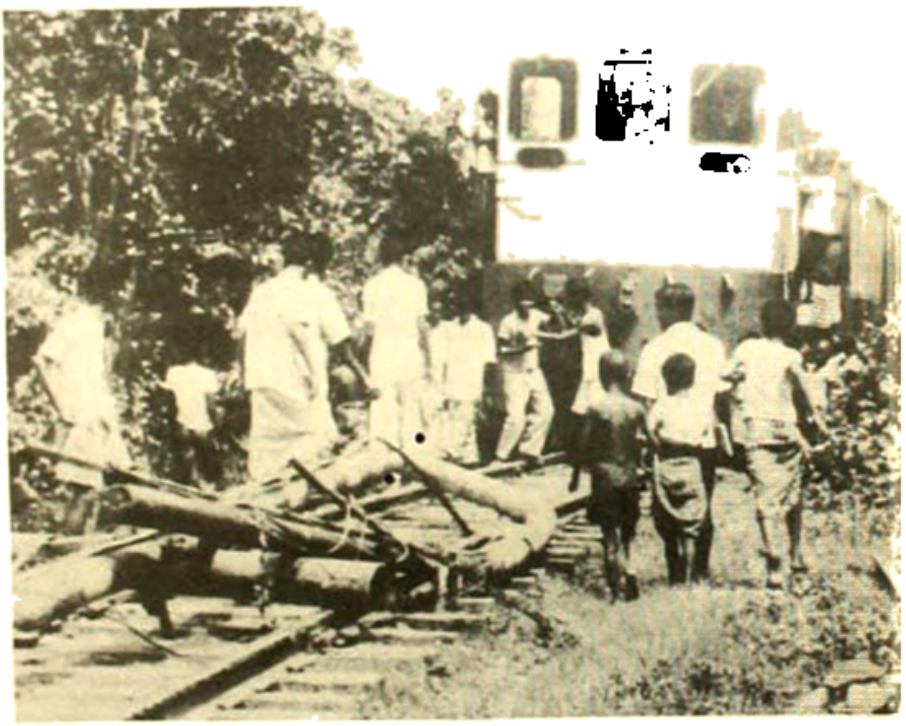

পাকিস্তান হওয়ার সময় শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৬ জন। ১৯৭০-৭১ সালে এসে তা দাঁড়ায় শতকরা ২৬ জনে। অর্থাৎ পাকিস্তান হওয়ার পর শিক্ষার হার বেড়েছে শতকরা ১০ জন। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার হার বেড়েছে শতকরা ৭ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়েছে শতকরা ১৩ জন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার। ১৯৭০-৭১ সালে এসে দাঁড়ায় ৬৫ হাজারে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার। ১৯৭০-৭১ সালে এসে দাঁড়ায় ৩৮ হাজারে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। ১৯৭০-৭১ সালে এসে দাঁড়ায় ২৭ হাজারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চার গুণেরও বেশী। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের চার গুণেরও বেশী। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত উন্নয়ন খাতে ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয় ৩২৭ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে খরচ করা হয় ৭৬ কোটি টাকা। বিভিন্ন উন্নয়ন-প্রকল্পে যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয় তার শতকরা ৭৫ ভাগ খরচ করা হয় পশ্চিমাংশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য দেয় তার শতকরা ৭৫ ভাগ পাচ্ছিল পশ্চিমাংশ, আর অন্যান্য দেশ যে সাহায্য দিয়ে থাকে পূর্বাংশ পায় তার শতকরা ৭৫ ভাগ। গুরুনির্মাণ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের শতকরা ৮০ ভাগই খরচ করা হয় পশ্চিমাংশে।

যেমন অর্থবিনিয়োগ, তেমনি চাকরি-বাকরির ব্যাপারেও পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের শতকরা ৮০ জন পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে। প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি, প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি, ফরেন সার্ভিসের ক্ষেত্রেও বাঙালীদের সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগ করে কমানো হয়। আর সৈন্যবাহিনীতে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ক্ষেত্রে ৮০ কোটি হাজার।

কৃষিক্ষেত্রেও একই বৈষম্যের ছবি। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে পাকিস্তান [illegible] হয়েছিল, এর শতকরা ৬৬ ভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান। ওই একই সময়ে বাঁধের উন্নয়ন লাঙ্গলাদিতেও শতকরা উনসত্তর ভাগই পায় পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিক্ষেত্রগুলি। ট্রাক্টরেরও শতকরা একাশিটি বরাদ্দ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, বাঙালী কৃষকদের শতকরা নব্বই ভাগ কোনো ট্রাক্টর দেখেনি।

আর শিল্পোন্নয়নের কথা না তোলাই ভালো। পশ্চিমী শাসক চক্র পূর্বাঞ্চলকে একটি উপনিবেশ হিসেবেই দেখতেন, এমন বাজার, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য অবাধে চালান দেয়া যাবে। এবং সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের

৭ মার্চ ১৯৭১। মুজিবের ভাষণ শুনতে জনসভায় লাখো লাখো বাঙালী। আর ইয়াহিয়ার মিলিটারি শাসন নয়। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা চাই।

চিরকাল পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য; ফলে সেখানে শিল্পোন্নয়নের প্রতি কোনও চেষ্টা তারা করেনি।

সন্দেহ নেই যে, যাকে আমরা বাঙালী জাতীয়তাবোধ বলে জানি, মূলত ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে তার প্রথম-বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। পরে, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানী বঞ্চনা ও অত্যাচারের চেহারা যত স্পষ্ট হতে থাকে, বাঙালী জনমানসে সেই বোধের শিকড় ততই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়। তাই তারা পশ্চিম থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন, এবং রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের অবহেলিত বাংলার তাবাদর্শের মধ্যে নিজেদের মুক্তি খুঁজতে থাকেন। রবীন্দ্রবর্জনের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন পূর্বাঞ্চলের বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক-সমাজ, তাকে— বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রীতির তো বটেই, প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধেরও অভিব্যক্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

যদি বলি যে, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশবাসীর কাছে সেই প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধেরই মূর্ত প্রতীক রূপে দেখা দিয়েছিলেন, তা হলে ভুল বলা হবে না। তাঁর আওয়ামী লীগ যে ছ'-দফা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনে নেমেছিল, পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বস্তুত তা বাঙালী জাতির রক্ষাকবচ। দাবিগুলি আদায় হলে তবেই পশ্চিমী অত্যাচারের কবল থেকে বাঙালীরা রক্ষা পাবে ও স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবে। অন্যথায় তাদের বিলুপ্তি অনিবার্য।

সমগ্র বাঙালীসমাজ শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের পতাকাতলে এসে সমবেত হলেন। তার ফল কী হয়েছিল, তা কারও অজানা নয়। প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টিই পেল আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল আরও চমকপ্রদ। পূর্বাঞ্চলের জন্য বরাদ্দ আসন-সংখ্যার মধ্যে মোট ১৬২টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। তার ১৬০টিই পেলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। পশ্চিম ও পূর্বের বরাদ্দ মিলিয়ে পাক জাতীয় পরিষদের মোট আসন-সংখ্যা ৩১৬। আওয়ামী লীগ পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক পরিষদে তো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলই, জাতীয় পরিষদের ১৬০টি আসন দখল করায় সেখানেও তার গরিষ্ঠতা হল নিরঙ্কুশ।

পশ্চিমী শাসকচক্র প্রমাদ গনলেন। মুজিবের জনপ্রিয়তার খবর তাঁরা রাখতেন, কিন্তু তাঁর জয় যে এতটাই চমকপ্রদ হবে, তা নিশ্চয় তাঁদের হিসেবে ছিল না। এখন তাঁরা দেখলেন যে, শুধু পূর্বাঞ্চল নয়, গোটা পাকিস্তানেই বাঙালীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। অতঃপর আবার নতুন করে শুরু হল তাঁদের নগ্ন, বীভৎস ষড়যন্ত্রের খেলা। 'অনিচ্ছুক স্বৈরশাসক' ইয়াহিয়া খাঁর মুখোশ নিমেষে খসে পড়ল। মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ডিকটেটরের মুখ।

পঁচিশে মার্চের আগে মঞ্চে ও নেপথ্যে

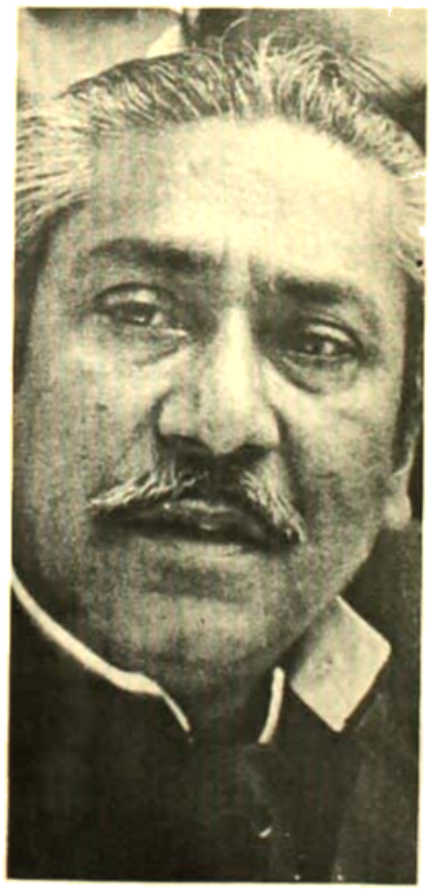

চক্রান্তের নীল নকশা তৈরী হয়েছিল আগেই। কেবল দিনক্ষণ, সময় ও সুযোগ বুঝে তা কাজে লাগানোর অপেক্ষা। সে অপেক্ষার অবসান ঘটে ঘটে ঘটে

শুক্রবার, ১২ মার্চ, ১৯৭১। সকাল পাঁচ মিনিট। ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করছেন ভারতীয় বিমান-ছিনতাইকারী ও তাদের বন্দী সঙ্গীরা। ছবিটি তোলা হয়েছে বিমানবন্দরের ভবনের দ্বিতীয় তলার বারান্দা থেকে। ছবির ডানদিকে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ২২ জানুয়ারী তারিখে পিপলস পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানে একটি প্রকৃত ফেডারেশন গঠনের প্রশ্নে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে একমত।' ২৭ জানুয়ারীতে ভুট্টো এলেন ঢাকায়। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা। ঢাকা বিমান-বন্দরে বললেন, সাংঘাতিক গুরুত্বের প্রতিশ্রুতির প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শেখ মুজিবের বাসভবনে তারা এক যুগ্মবৈঠকে মিলিত হলেন ৭০ মিনিটের জন্য। আলোচনা-শেষে ভুট্টো বললেন, এই বৈঠক দ্বারা সুখী ও সম্মানিত বোধ করছেন। ২৮ জানুয়ারীতে ভুট্টোর হোটেল কক্ষে আবার আলোচনা, ৭০ মিনিটের জন্য। দলীয় নেতারা আলাদাভাবে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা চালালেন। পরদিন তৃতীয় দফা মুজিব-ভুট্টো বৈঠক। বৈঠক শেষে ভুট্টো বললেন, একটি জনকল্যাণমূলক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তিনি সবরকমে সহায়তা দেবেন। ৩০ তারিখে এম, এল, নাবিক জাহাজ যোগে মুজিব-ভুট্টোর নৌবিহার পাঁচঘণ্টাব্যাপী। সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে তার আলোচনা সফল হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমরা দু নেতাই আলোচনায় সন্তুষ্ট। তবে আলোচনার দ্বার খোলা রইল। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের মতামত জেনে অমীমাংসিত বিষয়গুলো আলোচনার জন্য আবার বৈঠকে বসব।' বহুরূপী জনাব ভুট্টোর মুখের দিকে কেয়ানো মুখটিই আর সেদিন দেখতে পেয়েছিল বাঙলা দেশের জনগণ। পাঁচই মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার আশায় তারা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জনাব ভুট্টো নতুন চেহারা ধারণ করলেন ঢাকা ছেড়ে লাহোরে পৌঁছেই। এ যেন পূর্ব-নির্ধারিত ছক-কাটা প্রোগ্রাম। জনাব ভুট্টো ঢাকা ছেড়ে লাহোরে পৌঁছবার আগেই ৩০ জানুয়ারী তারিখে সারা দেশের মানুষ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল, কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা নামধারী ৫ জন বিমান-দস্যু ভারতীয় বিমান জলপা জোর করে লাহোরে নামিয়েছে। শুরু হল, পাকিস্তানে ভুট্টোদের রাজনীতির ছকে নাটকের আরেক অঙ্কের অভিনয়।

ব্যবস্থাটা সম্ভবতঃ আগেই দেওয়া ছিল, এখন পূর্ব-নির্ধারিত কাজ শুধু দক্ষতার সঙ্গে করে যাওয়া। ৩১ জানুয়ারীতে ভুট্টো নামলেন লাহোর বিমান বন্দরে। পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে অবাধে বিমান-দস্যুদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিলেন। তাদের গলায় হার রেখে ভুট্টো অপরাধীদের অনেকক্ষণ সালাপ করলেন, তাদের কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। জনাব ভুট্টোর প্রশংসায় উৎসাহিত বিমান-দস্যুরা ২ ফেব্রুয়ারী অপহৃত ভারতীয় বিমান জলপা বিনা বাধায় পাকিস্তানী প্রহরীদের চোখের সামনে বসে করে দেয়। বাঙলা দেশে কারো বুঝতে বাকি রইল না, পাকিস্তানের সামরিক জুন্টা ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য শেষ চাল হিসেবে ভারতের সঙ্গে বিমান ও উত্তেজনা সৃষ্টি এবং সেই বিমানের

প্রেসিডেন্ট ভবন আলোকসজ্জায় সেজে রোজের আসছেন বলেকরা। ১১ মার্চ শুক্রবার অনুষ্ঠানসূচীর অন্তত ৩০ জন সাধারণ মানুষ নিহত হন। তাই শেখ সাহেবের যেতেরে অনেকে সেলাম-টিপ ফুলস্তবক। সন্তাসে যারা প্রাণ হিয়েছেন, তাদের স্মরণে।

অনুষ্ঠানে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডাকার সুযোগ গ্রহণ করতে চান। তাদের এই চক্রান্তে প্রধান সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছেন জনাব ভুট্টো ও ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে ভারতীয় বিমান অপহরণে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত করার জন্য এটা পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী মহলের একটা বড় চক্রান্ত।' ওই একই তারিখে ভারত সরকার ভারতীয় এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। (পরে অসামরিক বিমান চলাচলের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।) ফাঁকিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ছুটে যান করাচীতে। এবার জনাব ভুট্টোর সঙ্গে মোলাকাত। সাংবাদিকদের কাছে ইয়াহিয়া বললেন, তিনি অবসর বিনোদন ও শিকারের জন্য করাচী এসেছেন। রাজনৈতিক আলোচনা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ১ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বললেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এখনও আহূত না হওয়ায় তিনি সামরিক জুনটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। সঙ্গে সঙ্গে জনাব ভুট্টো ১০ ফেব্রুয়ারীতে মুলতানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, তারও অভিযোগ, সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করছেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও বললেন, যদি ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তাহলে তিনি অধিবেশন যোগ দেবেন।' পরদিনই জনাব ভুট্টো আগের দিনের বক্তব্য অস্বীকার করলেন। বললেন, এমন কথা তিনি বলেননি। কতিপয় দেশী ও বিদেশী শক্তি দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই প্রথম জনাব ভুট্টো প্রকাশ্যে এক দেশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কথা ঘোষণা করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন, ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসবে। একই দিনে পাকিস্তানে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জনাব ভুট্টো সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ-নেতা আইনুদ্দিন খানের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের পর ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে পেশোয়ারে এক সাংবাদিক বৈঠকে জনাব ভুট্টো নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করলেন, '৬ দফার প্রশ্নে কোন আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা না থাকায় তার দলের পক্ষে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব হবে না। তবে ৬ দফার কোন রদবদল বা আপোষের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলে তারা যে কোন দিন ঢাকা যাবেন।' জনাব ভুট্টোর এই হুমকি সম্পর্কে শেখ মুজিব কোন মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান। ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে বালুচ নেতা সরদার আকবর খান বুগতি ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বানচাল করার জন্য জনাব ভুট্টো যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা পাকিস্তানের দু' অংশকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই নেয়া হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জরুরী তলব পেয়ে জনাব ভুট্টো পিণ্ডি রওয়ানা হন। একই তারিখে ঢাকায় জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার অফিসে এক্সল

প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে ঘরের বাইরে আসেন। উৎসুক দৃষ্টি-জনতা বৈঠকের ফলাফল জানতে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন।

অন্তঃসারশূন্য বলি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। আওয়ামী লীগ-সমর্থক একটি পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়, ঢাকায় যাতে নির্ধারিত তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না বসে, এবং অরাজকতা সৃষ্টির জন্যই স্বার্থান্বেষী মহলের এই চক্রান্ত। 'ভারতীয় বিমান অপহরণ ও লাহোর এবং ঢাকায় এই বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে যোগসূত্র ও চক্রান্তের হাত সুস্পষ্ট।' ২১ ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবসে শেখ মুজিব পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন, 'আসুন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই আমরা ৬ দফা সম্পর্কে খোলাখুলি ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করি। কিন্তু মঞ্চের নাটক ও নেপথ্যের মহড়া তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এরপর ফেব্রুয়ারীর পরই শুরু হল, পাকিস্তানের রাজনীতিতে দ্রুত ও নাটকীয় পট-পরিবর্তন।

২২ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার অসামরিক মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করে দেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের গবর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসেন। একই দিনে কাইয়ুম খান ঘোষণা করেন, তার দলও জনাব ভুট্টোর দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাবেন না। ২৪ তারিখে শেখ মুজিব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ঘোষণা করলেন, 'জনসাধারণের নির্বাচনী বিজয় বানচাল করার প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনসাধারণের সতর্ক ও সজাগ হওয়া দরকার।' ওই তারিখে কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের দল কাউন্সিল মুসলিম লীগও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা যাবেন না। ২৬ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে জনাব ভুট্টোর সোপন বৈঠক ও দুপুরের ভোজ। ২৭ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য ৬টি দলের ৩০জন সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৮ তারিখে জনাব ভুট্টো দাবী জানালেন, জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখতে হবে। তবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্দিষ্ট ১২০ দিনের সময়সীমা বাতিল হলে তিনি অধিবেশনে যোগ দেবেন। পিপলস্ পার্টির সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়া পরিষদের অধিবেশন বসলে তিনি খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করবেন। পিপলস্ পার্টির অংশ গ্রহণ ছাড়া জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশেই পূর্ণ হরতাল পালনের আহ্বান জানাবেন। তিনি আরও বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ ৬ দফার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ওই রাতেই পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করলেন, জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৬টি আসনে আপাততঃ নির্বাচন স্থগিত রাখা হল। বাঙলা দেশের মানুষের বুঝতে বাকি রইল না হাওয়া কোন্ দিকে বইছে।

১ মার্চ সোমবার ১৯৭১। ঢাকার আকাশ ঝকঝকে নীল। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছে। তিন হাজারের মত দর্শক খেলা দেখতে উপস্থিত। খেলা দেখার মাঝেও চলছে উত্তেজিত রাজনৈতিক আলোচনা। সেদিন ঢাকার প্রভাতী সংবাদপত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ খবর বেরিয়েছে। এক, আগের দিন (রবিবার) পি, আই, এ, বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন জাতীয় পরিষদ সদস্য ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। তারা প্রায়শঃই ওয়ালি-মুজাফ্ফর গ্রুপের। দুই, রবিবার বিকালে ঢাকার নিশ্চল ও বনির অধিবাসীর সম্বর্ধনা-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "জনাব ভুট্টো তার দলের ৮০জন সদস্য নিয়ে ঢাকা আসতে চান না। আমি যদি বলি, ১৬০জন সদস্য নিয়ে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে যাব না, তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়? পরিষদে আলোচনার না বসে আগে কি করে আমরা প্রতিশ্রুতি দেব যে, ৬ দফা সংশোধন করা হবে? ৬ দফা একদল জনগণের সম্পত্তি, তাদের নির্বাচনী ইস্যু। ব্যক্তিগত ভাবে এটা সংশোধন বা পরিবর্তনের অধিকার আমার নেই। আসলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র চলছে। এই চক্রান্ত অব্যাহত থাকলে পরিণামে যা ঘটবে, তজ্জন্য চক্রান্তকারীরাই দায়ী হবেন।" পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন সদস্য ও নেতা শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাদের মূল্যবান পরামর্শ দেয়ার সুযোগ দেয়া হলে তারা অধিবেশন যোগ দেবেন বলে যে উক্তি করেছেন, এর উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেছেন, যদি একজন সদস্যও কোন ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব দেন, তা গ্রহণ করা হবে। আমরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে অন্যায় কিছু করবো না।"

এর দুদিন পরেই ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। তাই বাঙলাদেশের সকলের মনেই তখন উদ্বেল প্রতীক্ষা। আশা ও আশঙ্কায় মিশ্র অনুভূতি। শেষ পর্যন্ত জনাব ভুট্টো তার মত পালটাবেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার প্রতিশ্রুতি রাখবেন, এটাই বাঙলাদেশের মানুষের একমাত্র আশা। সোমবার সকাল দশটার আগেই জানাজানি হয়ে গেল, দুপুর একটায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার ভাষণ দেবেন। কি নতুন কথা বলবেন তিনি? মুহূর্ত মুহূর্ত

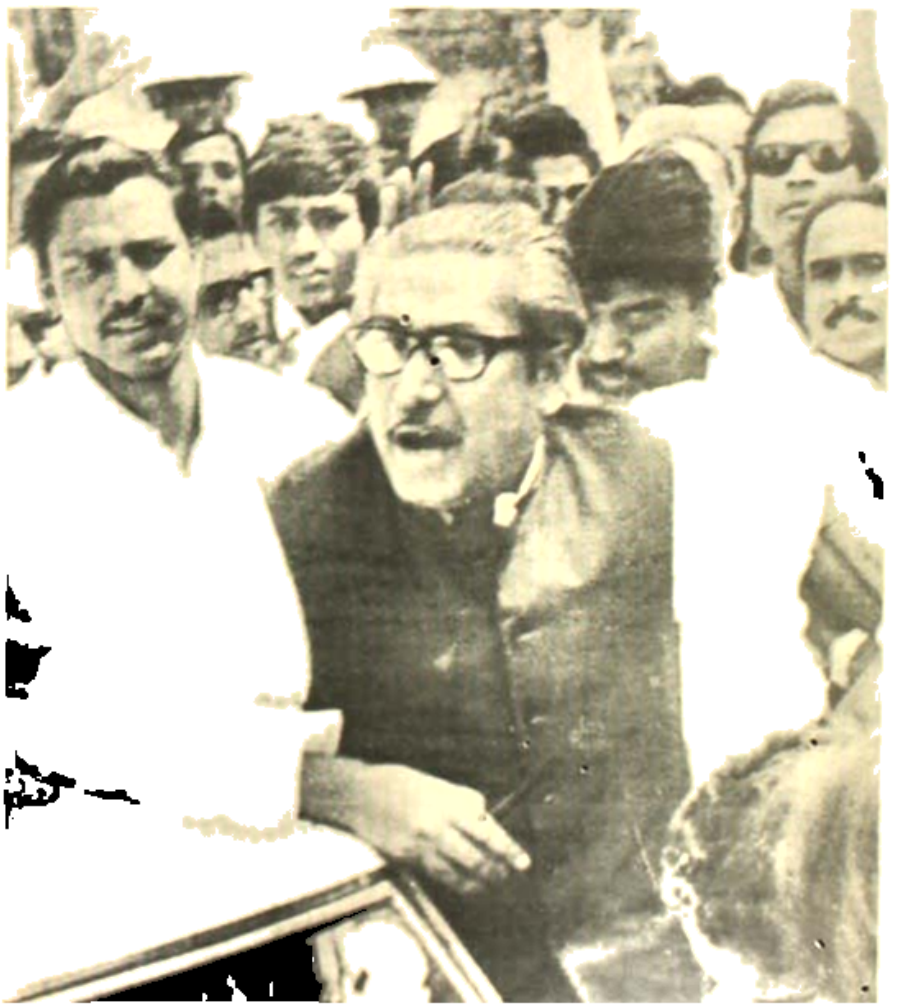

ইয়াহিয়ার ভাষণ আর এক ঘন্টা থেকে এমন সময় মুজিবকে খবর দিলেন প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে। তাঁর একান্তিক আলাপের জন্য। তিনি মোটরের উপর হাত রেখে বললেন, আর না হয় পর্যন্ত আমরা জাতীয় পরিষদে যেতে পারি না।

আশঙ্কা-কম্পিত বুকে সকলেই অপেক্ষারত। বেলা একটায় বেতার ঘোষক বললেন, এবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভাষণ দেবেন। কিন্তু না। ইয়াহিয়ার কণ্ঠ নয়। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা পাঠ করলেন অপর একটি কণ্ঠ 'জাতীয় পরিষদের বৈঠক ৩ মার্চ এতিথে বসবে না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রইল।' আলাভোলার বেদনায় প্রথমে সকলেই হতচকিত, মূক। এরপরই গর্জে উঠল সারা ঢাকা। স্টেডিয়ামের খেলা ছেড়ে, টাবুতে আগুন ধরিয়ে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ দর্শক বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ঢাকা হাইকোর্টের সামনে একটি স্টেট বাস অগ্নিদগ্ধ হল। লক্ষ বিক্ষুব্ধ মানুষ সমবেত হল হোটেল পূর্বাণীর সামনে। সেখানেই বিকেল চারটেয় শেখ মুজিবের সাংবাদিক সভা। শেখ সাহেব সাংবাদিক সভা শেষ করে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখা একটি চক্রান্তের পরিণতি ছাড়া কিছু নয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মতামত উপেক্ষা করে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতার প্রতিটি দাবী মেনে নেয়া হচ্ছে। এটা গণতন্ত্র নয়, স্বৈরতন্ত্র। এর প্রতিবাদে প্রথম কর্মসূচী হিসাবে পরদিন ঢাকায় এবং তার পরের দিন সারা বাঙলাদেশে হরতাল পালিত হবে এবং ৭ মার্চ রেসকোর্সে জনসভা হবে। এই সভায় ঘোষিত হবে আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী। শেখ মুজিব আরও বললেন, 'আগামী ৭ মার্চের মধ্যে যদি বর্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটানো না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তজ্জন্য তিনি দায়ী থাকবেন না।' শেখ মুজিবের এই বক্তব্য সমর্থন করে জনাব নুরুল আমিন সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বললেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা অযৌক্তিক এবং দেশে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের পথে আবার বাধা সৃষ্টির চক্রান্ত।

ভাগ্যের পরিহাস, এই নুরুল আমিনই এখন জনাব ভুট্টোর প্রধান সহযোগী।

১ মার্চ তারিখে আরও দুটি ঘটনা ঘটল। বাঙলাদেশের গবরনর আইস এডমিরাল আহ্সান পদচ্যুত হলেন এবং সামরিক প্রশাসক লেফটেনান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান অসামরিক প্রশাসনেরও দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সামরিক প্রশাসনের ১১০নং সামরিক আইন নির্দেশে বাঙলাদেশের সংবাদপত্রে শেখ মুজিবের আহ্বানে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার খবর ও ছবি ছাপা নিষিদ্ধ করা হল।

২ মার্চ রাত পৌনে আটটায় ঢাকা বেতারে ঘোষণা করা হল, রাত আটটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হল এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রাত সাতটা থেকে পরদিন সকাল সাতটা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকবে। সে রাতেই বিক্ষুব্ধ জনতা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে এবং সেনাবাহিনীর গুলী বর্ষণে বহুলোক হতাহত হয়। আন্দোলন সারা বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করে। বাঙলাদেশে প্রচণ্ড গণ বিক্ষোভের খবর পাওয়ার পর জনাব ভুট্টো সদলে ৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ওই দিনই জেনারেল ইয়াহিয়া এক অনির্ধারিত বেতার ভাষণে ঢাকায় ১০ মার্চ তারিখে এক রাজনৈতিক নেতৃ সম্মেলন আহ্বান করেন।

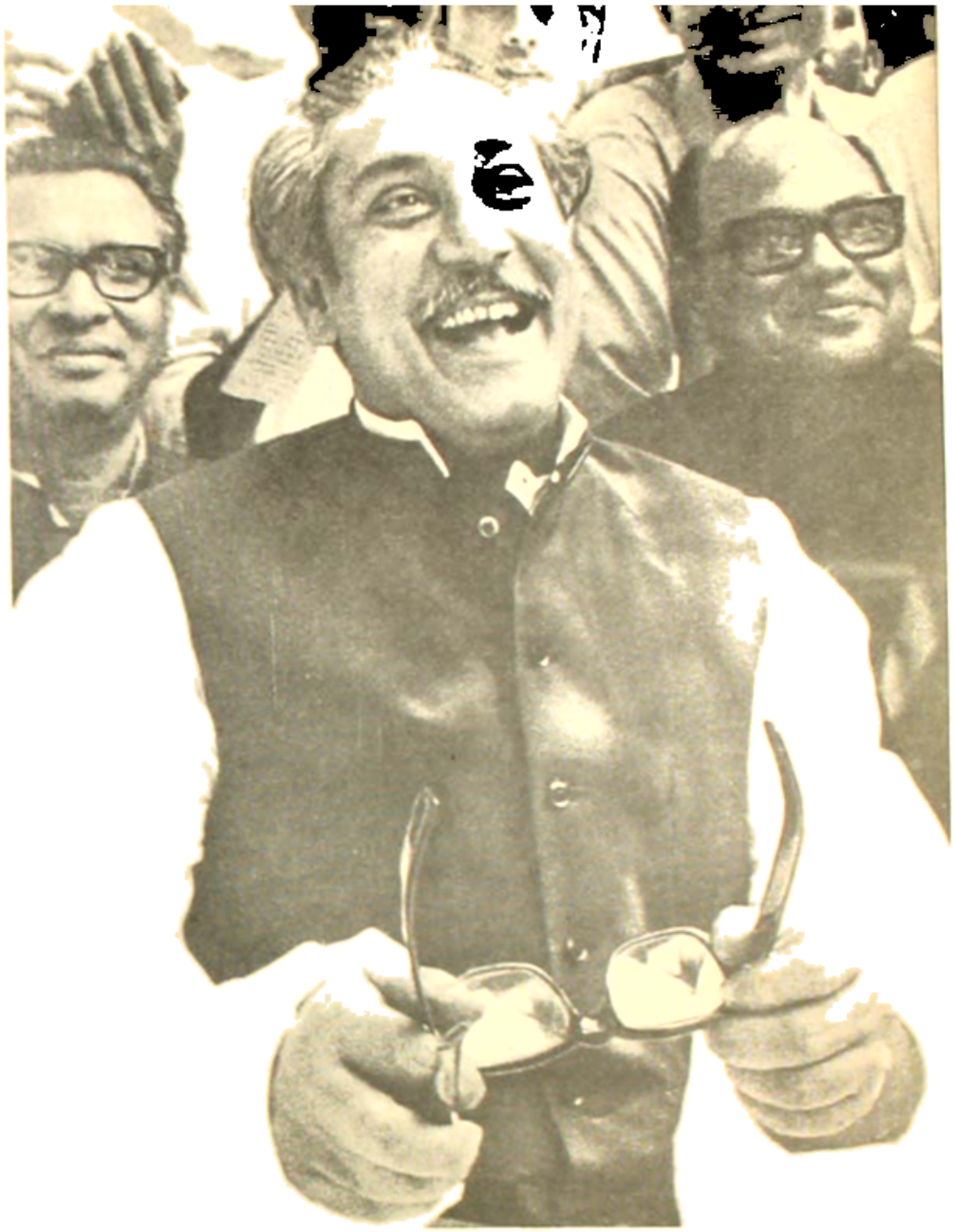

২০ মার্চ। ধানমন্ডীর বাড়িতে
কি কথায় বঙ্গবন্ধুর মুখে হাসির
ঝলক উঠেছে, চোখের চশমা
খুলে রেখে দিয়েছেন তিনি।
ডানদিকে জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ—বাঁদিকে
জনাব মনসুর আলী

শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশের প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন, "ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে জেনারেলের সৈন্যবাহিনী যখন ব্যাপকভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে, লাখ লাখ মানুষ যখন নিহত হচ্ছে, তখন এই আলোচনা এক নির্মম প্রহসন। কামানের গর্জনের চেয়ে ধ্বনি যখন আমাদের কানে বাজছে, সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে, তখন এই সম্মেলনে আমরা জানাবো বন্দুকের নল উঁচিয়ে আমরা জানাবো সামিল।"
এই দিন প্রবল গণ বিক্ষোভের মুখে সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনার সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। সৈন্য বাহিনীর গুলিতে প্রতি স্থানেই বহু লোক হতাহত হয়। বিকেলে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, 'এটা অসহযোগী পদ্ধতিতে বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।' আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে তিনি ৬ দফার পূর্ণ ছুটা থেকে দুটা হরতাল, কোর্ট-কাচারীসহ সকল অফিস, কলকারখানা, রেল স্টীমার বন্ধ, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সকল খাজনা ও ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দান করেন। জনাব নুরুল আমিন এইদিন এক বিবৃতিতে জনসাধারণের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে তার সমর্থন

জানান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

৩ মার্চ তারিখে শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে জানান, ওই দিন পর্যন্ত শুধু ঢাকা শহর ও শহরতলীতেই সামরিক বাহিনীর গুলীতে তিনশো ব্যক্তি নিহত এবং দু' হাজার ব্যক্তি আহত হয়েছে। অন্যত্র, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী থেকেও বহু লোক হতাহত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়।

৬ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের ঐতিহাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। ওইদিনই লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে বাঙলাদেশের গবর্নরের পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। ঢাকার সেনানীল জেলের গেট ভেঙে সোয়া তিনশো বন্দী পলায়ন করে। ১৬জন আবার ধরা পড়ে। এরপর শুরু হয় শত্রুদের অন্যান্য শহরে জেল ভাঙার পালা।

৭ মার্চ বিকালে ঢাকার রেসকোর্সের মাঠে বন্দ লক্ষাধিক বিক্ষুব্ধ জনতার সমাবেশে শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যার দলের যোগদানের চারটি পূর্বশর্ত ঘোষণা করেন। (ক) সামরিক আইন তুলে নিতে হবে। (খ) সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। (গ) নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। (ঘ) গণহত্যার উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। রেসকোর্সে শেখ মুজিবের ভাষণ সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বেতারে প্রচার করতে না দেয়ার অজুহাতে সরকারী প্রেসের আদালতের কর্মচারীদের মত ঢাকা বেতারের কর্মীরাও কাজ বন্ধ করে দেন। পরদিন এই ভাষণ প্রচারের অনুমতি দেয়া

হবে আবার বেতারবন্ধ চালু হয়। শেখ মুজিব ৮ মার্চ থেকে এক সপ্তাহের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের যে কর্মসূচী ঘোষণা করেন এই কর্মসূচীতে ছিল সচিবালয় কার্যত অচল করা উদ্যোগ, আদালত ও স্কুল কলেজ বন্ধ করা, সরকারী অফিস আদালত এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা। অসহযোগ আন্দোলন চলে। টেলিফোন সেবা চালু করা, সামরিক বাহিনীর টেলিফোন ব্যবহার অসহযোগ, পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ প্রেরণ বন্ধ, আদমজী জুটমিলসহ সকল শিল্প কারখানা বন্ধ করা, সৈন্য বাহিনীর চলাচল ও নতুন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানীর ক্ষেত্রে অসহযোগ এবং খাদ্য ও টাকা বন্ধ করা প্রভৃতি।

শেখ মুজিবের নির্দেশে বাঙলা [illegible] আন্দোলন চালু হয়। লাহোরের এক সংবাদপত্র বক্তৃতা প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করে। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান প্রধান) বলেন, শেখ মুজিবের বেসামরিক বেসামরিক শাসনের মইনাত ও নৈতিক অধিকার রয়েছে এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার উচিত অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তখন পাওয়ালপিন্ডি থেকে ঘোষণা করেন, এবার দল একটি সংবিধান পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে। ১ মার্চ তারিখে মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে বৃটিশদের মত জেনারেল ইয়াহিয়াকেও বাঙালীদের সঙ্গে ভালো ফলপ্রসূ একটা বোঝাপড়া করে বাঙলা দেশের স্বাধীনতা মেনে নেয়ার উপদেশ প্রদান করেন। ওই দিন রেডিও জেনারেল টিক্কা খানকে বাঙলাদেশের সামরিক শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্তির কথা প্রচার করা হয়। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি. এ. সিদ্দিকী পূর্বদিন তাকে গবর্নর হিসাবে শপথবাক্য পাঠ

৩রের ভাষণ' আমরা এর বিশ্লেষণ—এর অর্থও দেব।
পাকিস্তান বন্ধের উপর গা দিয়ে আমি আসেম্বলিতে
ছেড়ে চাই না। যত রক্ত দিতে হয় দেব।
ইনশাল্লাহ, মনে রাখবেন এবারের সংগ্রাম আমাদের
মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
এ ইতিহাস বাঙালির মানুষের রক্তের ইতিহাস,
বাঙালীর অশ্রু দিয়ে লেখা ইতিহাস।
আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম,
শহীদের উপর, বাঙালীর উপর গুলি করা হয়েছে।
আমাদের কথা বলা হয়েছে—আপনি এখানে আসুন,
দেখুন। তিনি এলেন না। আমি ঘোষণা করেন
মন্ত্রণালয়, বললাম ঘরে ঘরে দুর্গ গড়, প্রতিরোধ কর।
আমার কথা সকলে মানলেন। বললাম, কোন কিছু
চলবে না। কিছু চলল না।
আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া
খোদ টেবিল বৈঠক ভেঙেছিলেন। ২৫ মার্চ রাত্রিতে
আসেম্বলি ভেঙেছেন। অথচ রক্তের দাগ এখনো
শুকোয়নি। আমি বলে দিতে চাই শহীদদের রক্তের উপর
পা দিয়ে মুক্তির সমান আসেম্বলি ডেকে পারে না।
জনতার চূড়ান্তদিবস বারে আমরা হরতাল করতে হবে।
হরতাল শেষ যোগদান করি কি না। আমাদের আমি
না মানলে আসেম্বলিতে বসতে পারি না।

জনগণ আমাকে সে অধিকার দেবেনি।
ভাইরা, আমার উপর আপনাদের বিশ্বাস আছে?
আছে — আছে — আছে!
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না,
আমরা মানুষের অধিকার চাই।
আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট কাছারি,
আদালত, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য
বন্ধ থাকবে। যতদিন না হওয়া পর্যন্ত টাকা বন্ধ করে
দেওয়া হল।
আর পাঞ্জাব পাকিস্তানের এক পয়সাও যাবে না।
আর যদি একটি গুলি চলে, যদি আমার দেশেরকোন
মানুষকে—তাহলে যার যেটার যা আছে তাই দিয়ে
যা কিছু আছে, তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।
আমরা ওদের ভাতে মারব, পানিতে মারব।
যুদ্ধে লাখ কোটি মানুষকে ঠেকে রাখতে পারবা না
আমরা মরতে শিখেছি, কেউ আমাদের রুখতে পারবে না
হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী অবাঙালী—সবাই আমার ভাই।
তুমরদের রক্তার যারির আমাদের সন্তানের।
দেখবেন, আমাদের টেন যেন বন্ধ না হয়।
মনে রাখবেন, আমি কোনদিন বেইমানি করিনা।
আমি জন যেন আমার জন্য প্রস্তুত। জয় বাংলা।

৭

...অবশ্য কেমোরেল মন্তব্য। ৭ মার্চ। ১৯৭১। সরকারী অফিসারদের বলছি—আমি যা বলি তা মানতে হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আমি আমার জানিয়ে দিতে চাই—দেশকে একেবারে ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে যাবেন না। মিলিটারি শাসন চালাবার আর চেষ্টা করবেন না...

করানোর অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তাবকে জানান। ১০ মার্চ তারিখে জানা যায়, ঢাকায় অবস্থানকারী জাপানী ও জারমান নাগরিকদের সরিয়ে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট পূর্ব বাঙলায় অবস্থানকারী জাতিসংঘের কর্মচারীদের প্রয়োজন বোধে সরিয়ে নেয়ার জন্য ঢাকার সহকারী রেসিডেন্ট প্রতিনিধিকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিব জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি এক বার্তায় বলেন, 'বাঙলাদেশে বাঙালীদের মানবিক অধিকার অস্বীকৃত হচ্ছে। ব্যাপক গণহত্যা চলছে এবং এই গণহত্যার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও সৈন্য ও অস্ত্র আনা হচ্ছে। এই সময় কেবল কর্মচারী সরিয়ে নিয়ে জাতিসংঘ তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না।' ১২ মার্চ লন্ডনের এয়ার মারশাল আসগর খান এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রাচ্যের অদূরদর্শিতার জন্য বাঙলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তান ৫ বছরও টিকে থাকতে পারবে না। ১৪ মার্চ বাঙলাদেশের অসামরিক কর্মচারীরা কাজে যোগ দেয়ার সামরিক নির্দেশ অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৫ মার্চ শেখ মুজিব বাঙলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু রাখার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন। বাঙলা দেশীয় দুটি ব্যাংককে সরকারকে দেয় কর ও কেন্দ্রীয় শুল্ক জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। ওই দিন দুপুরে ২টা ২০ মিনিটে জেনারেল ইয়াহিয়া আরও কয়েকজন জেনারেল সহ শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য কড়া সামরিক প্রহরায় ঢাকা পৌঁছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো দাবী জানান, কেন্দ্রের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি দলের হাতে এবং প্রদেশের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে দিতে হবে। ১৬ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু। কালো পতাকা শোভিত মোটরে শেখ মুজিব ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে গমন করেন। জনাব নুরুল আমিন ও আবদুল ওয়ালি খান তাদের স্ব স্ব বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ফিয়োরির তীব্র প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, একটি জাতীয় পরিষদে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে পারে না। ২ মার্চ থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত অসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য কোন্ পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী তলব করা হয়েছিল তা তদন্ত করে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠনের

সিদ্ধান্ত প্রচার করা হয়। শেখ মুজিব এই কমিশন গঠনের সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং সেনাবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করার মূল দাবি এড়িয়ে এই কমিশন গঠনকে একটি ধাপ্পা দেয়ার প্রয়াস আখ্যা দেন। ১৮ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া দ্বিতীয় বৈঠক। বৈঠক শেষে ওয়ালি খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার। এইদিন আরও জানা যায়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান প্রধান বিচারপতিকে সঙ্গে রেখেছেন হয় এবং সংবাদপত্রে এই মর্মে আশা প্রকাশ করা হয় যে, ২০ মার্চের বেতার-ভাষণে জেনারেল জরুরী বার্তা প্রেরণ করেছেন। একটি রাজনৈতিক মীমাংসার আশা জনমনে জাগ্রত হয় এবং সংবাদপত্রে এই মর্মে আশা প্রকাশ করা হয় যে, ২০ মার্চের বেতার-ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া জরুরী হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করবেন। ১৯ মার্চ বিকেলে জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে ১০ মিনিটব্যাপী বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট ভবন ছেড়ে বেরিয়ে এসে শেখ মুজিব জানতে পারেন, ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করেছে। প্রেসিডেন্ট ভবনে সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। এই খবরটি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, 'এই আলোচনা বৈঠকের অর্থ কি? নদীদের রক্তের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।' করাচী থেকে খবর প্রচারিত হয়, জনাব ভুট্টো ঢাকা আসার আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছেন। ২০ মার্চ বিকেলে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ধরে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। বৈঠকে প্রথমবারের মত উপরাষ্ট্রপতি উপদেষ্টাগণ প্রথম গ্রহণ করেন। জনাব ভুট্টো করাচী থেকে ঘোষণা করেন, জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছ থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পেয়ে তিনি ঢাকা যাচ্ছেন। ২১ মার্চ আবার মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। এইদিন প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে বড় সামরিক সাহায্যের জনাব ভুট্টো ঢাকা পৌঁছেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে দু' ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর তিনি ঘোষণা করেন, সব সমস্যার দ্রুত হয়ে যাবে। ২২ মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন, সকল দলের নেতৃবৃন্দের সম্মিলনে এবং আলোচনার

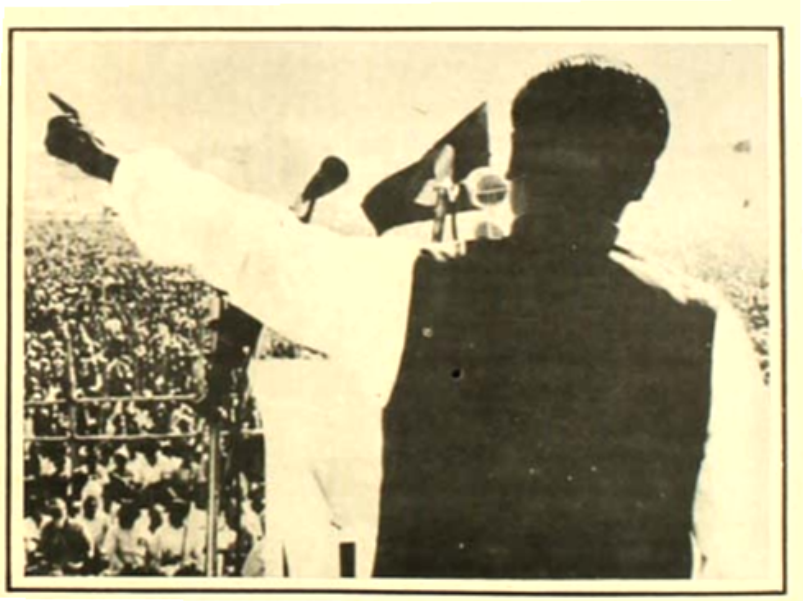

এখন চোরাগুপ্তা জানিয়ে শুনবে।
যদি বেতিক আমলের কথা না শোনে, তবে কোন বাঙালী বেতিক টেবিলে যাবেন না,
টেলিভিশনে যাবেন না (জনতার হাততালি)।
কেউ যদি আমাদের নির্দেশ না মেনে, তাদের কাছে যাবেন এ। আমি ঘোষণা করছি দুই ঘণ্টা
—যার মধ্যে মন্ত্রিসভা নিয়ে পারে।

স্বার্থে তিনি জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন আবার স্থগিত রাখছেন।
পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা এইদিন নিজেদের মধ্যে এক বৈঠকে মিলিত হন।
২৩ মার্চ শেখ মুজিব দুটির দিন ঘোষণা করেন এবং সর্বত্র বাঙলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার নির্ধারিত বেতার ভাষণ বাতিল করে দেন এবং এক বাণীতে বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "একত্রে থাকার সেক্ষেত্রসমূহের উপরে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।"
২৩ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতার দু'ঘণ্টা বৈঠক হয়। জনাব ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে যে ব্যাপক ঐকমত্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ফল

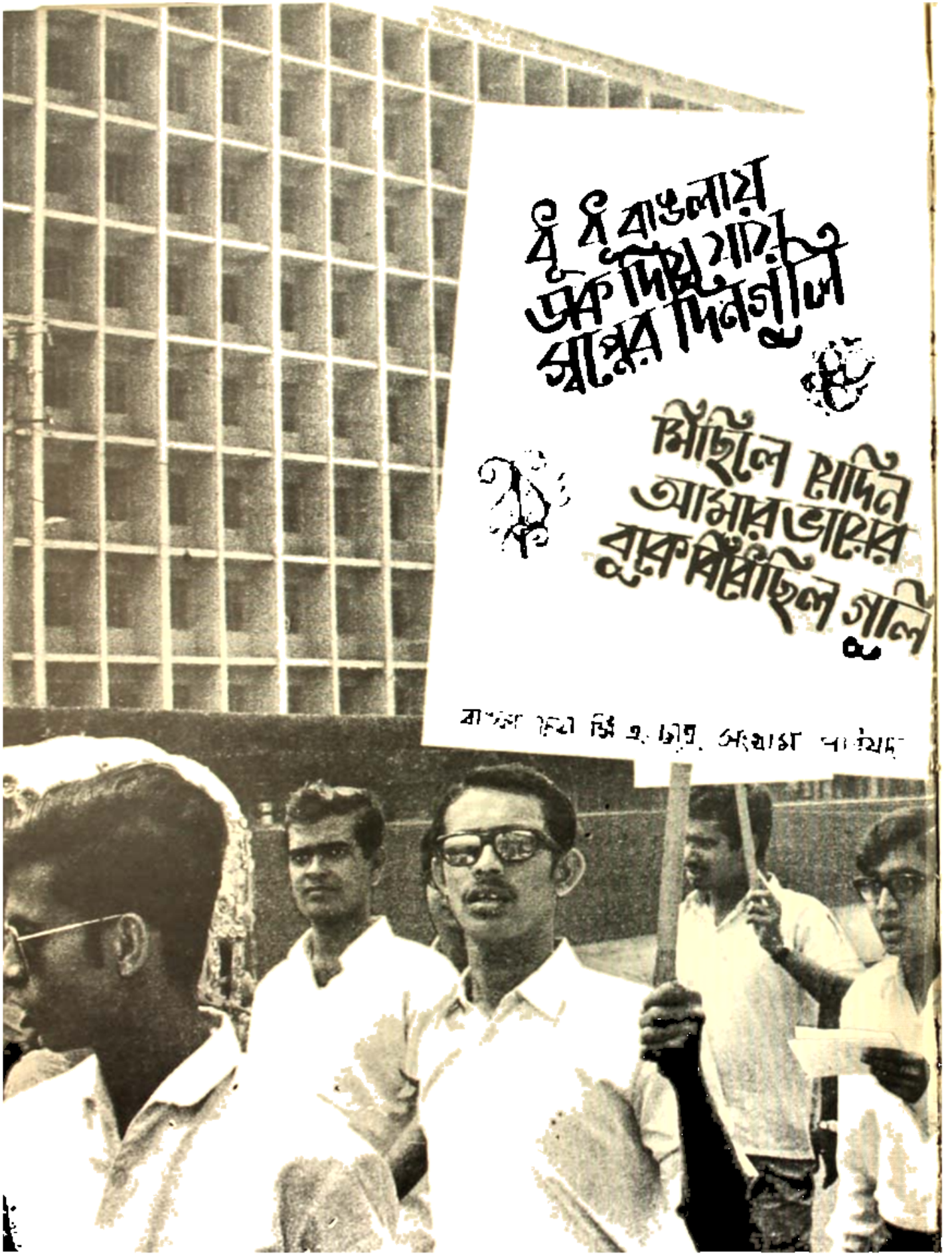
বুঝি বাঙলায়
ওরা দিয়ে যায়
স্বপ্নের দিনগুলি
মিছিলে সেদিন
আমার ভায়ের
বুক বিঁধেছিল গুলি

সেন্ট্রাল পরীক্ষা করে দেখছেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে তার সন্তোষজনক বৈঠক হয়েছে এবং তিনি আবার সাক্ষাৎকারের আশা রাখেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা জনাব মমতাজ দৌলতানা ঢাকায় ঘোষণা করেন, মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট এবং আশাবাদী। ২৪ মার্চ শেখ মুজিব ও জেনারেল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাগণ এক বৈঠকে মিলিত হন এবং পরের দিন (২৫ মার্চ) প্রেসিডেন্ট এক বেতার ভাষণে রাজনৈতিক মীমাংসা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করবেন বলে খবর প্রচারিত হয়। জনাব ভুট্টোর দলের সদস্যগণ (জনাব ভুট্টো বাদে) ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা এইদিন ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৫ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর গুলীতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রাণহানির খবর প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা সমরাস্ত্র জাহাজ থেকে নামাতে অস্বীকার করায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালী শ্রমিকদের উপর গুলী চালায়। শেখ মুজিব এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৭ মার্চ সারা বাঙলা সেলবন্দী হরতাল পালনের ডাক দেন এবং বলেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে আলোচনা ও রাজনৈতিক মীমাংসার নামে কালক্ষেপ করে বাঙালীদের দমন করার জন্য গোপনে পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

২৫ মার্চ রাত বারোটা। ঢাকার হাটখোলা রোডের মেহেরু একটি সংবাদপত্র-অফিসে টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই প্রশ্ন হল, শুনছি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আর ভুট্টো নাকি আজ রাত্রে গোপনে ঢাকা ছেড়ে পালিয়েছেন এবং সেনাবাহিনী রাজপথে নেমেছে গুলীর জবাব দেয়া হল না, টেলিফোনের তারে ভেসে এল প্রচণ্ড গোলা-গুলির শব্দ, স্বাধীনতা যুদ্ধের জয় বাঙলা শ্লোগান।

রাত দুটোর আগে সারা ঢাকা শহরে টেলিফোন-লাইনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। চারদিকে তখন আগুনের লেলিহান শিখা, আর হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত জয় বাংলাদেশ শুরু হল গণযুদ্ধ তাণ্ডব।

২৫ মার্চ গণহত্যার নিশীথ প্রতিবাদের মত সেদিনও পাকিস্তান নিধন বাংলাদেশের মাটিতে চলেছিল। পাশবিক। ঢাকার রাজপথে মিছিল আর মিছিল। তাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের ছাত্রীর পরাক্রম হাতে হাতের প্রতিরোধ নিধনের মিছিল আর এগিয়ে চলেছেন। অস্ত্রে মোকাবেলার যান।

মধ্যরাতের ঘাতক

সূর্য ডুবলো। পাঁচটা থেকে চুয়াল্লিশ।

ঠিক এক মিনিট পরেই ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এয়ারপোর্টে চলে গেলেন। কিন্তু খবরটা জানা গেল পৌনে আটটায়। তখন প্রেসিডেন্টের বিমান করাচি পাড়ি দিয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সারাদিন ধরে রেখেপোড়া নগরী চৈত্রের বিষাদে হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছিল।

তারপর দু' ঘন্টাও যায়নি। ক্যান্টনমেন্ট থেকে জিপ, ট্রাক বেরোই দিয়ে সৈন্য সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা ব্লক মোতাবেক পোজিশন নিচ্ছে। সোলজার, সাঁজোয়া, পদাতিক —তিন বাহিনী থেকে বাছাই তিন ব্যাটালিয়ন ঘাতক।

রাত ১০টা ৩৫। নর্থ ঢাকার সৈন্যরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ঘিরে ফেলেছে। রিসেপশনে কাং থোবড়ে চক খড়ি দিয়ে একজন যন্ত্রণা ক্যাপ্টেন লিখে দিল: বাইরে বেরোলেই গুলি।

বিদেশী সাংবাদিকরা বেরোতে না পেরে রেডিও ধরলেন। না। কারফিউর কোন ঘোষণা নেই। বাইরে ট্যাংকের ঘর্ঘর। ছুটে সবাই বারোতলায় উঠলেন। মেশিনগানের গুলিতে কান পাতা দায়। ছুটোর ঘরের দরজায় গিয়ে সবাই থমকে দাঁড়ালেন। কড়া পাহারা। কাঁচা ঘুমে জাগানো বাঙালি। ঢাকা-করাচি টেলিপ্রিন্টার লাইনও কেটে দেওয়া হয়েছে।

বাইরের পৃথিবী থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন।

তবে কি সব শেষ হয়ে গেল? ইয়াহিয়া পালাচ্ছে?

বৃহস্পতিবার। ২৫ মার্চ। ১৯৭১। খানিকবাদেই ইয়াহিয়ার মতে শুরুমার শুরু হয়ে যাবে। ঢাকার দু' জায়গায় তখন যুদ্ধপরাধ কাণ্ড শুরু হয়েছে।

প্রথম টার্গেট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে ছাত্রাবাস। সময় মধ্যরাত। মার্কিন এম-২৪ ট্যাংকগুলো কামান উঁচিয়ে ঘাটিতে দাঁতের দাগ ফেলে ফেলে ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ল।

সঙ্গে তিরিশ লরি সোলজার। ওরা রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে ঘাঁটি গেড়ে ইকবাল হলে গোলা ফেলছে। নীট নিবার ২০০জন ছাত্র। ইকবাল হলের কবিতন ঘরে বেড়ওয়াস। জগন্নাথ হলে ছিলেন ১০০জন হিন্দু ছাত্র। গ্রেনেড ছুড়তে ছুড়তে সৈন্যরা ঢুকলো।

৬জন ছাত্রকে কবর খুঁড়তে লাগিয়ে দিয়ে পালকবী সৈন্যরা বাকিদের ওপর সাবমেশিনগান থেকে গুলির ঝাঁক বুলিয়ে দিল। ৬জন ছাত্র দুঃস্বপ্নের ভেতর লাশগুলির কবর দিচ্ছিল। পিছে সব সময় নজর রেখেছে। তারপর তাদেরও ওরা গুলি করে ফেলে গেল। একজন বেঁচেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ডীন ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবকে জল্লাদরা রগড়ে রগড়ে মেরেছিল। তারপর ইউনিভার্সিটির ইতিহাস, ইংরেজি, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতির ইত্যাদি বিভাগের সাতজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে একই কায়দায় মেরে নিয়ে গেট বরাবর খুন করল। বুদ্ধিজীবীদের হত্যাযজ্ঞে এই একাত্তরে জল্লাদদলের যোগাযোগের সন্ধানে অনেক কিছু বিশ্লেষণ করা যাবে। বিশেষ করে অর্থনীতি, বাংলা সংস্কৃতি, পলিটিক্যাল সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত প্রফেসরদেরকেই খুঁজেছিল বেশি করে।

সাইকিয়াট্রিক বিভাগের প্রধান ডা. আলীমুজ্জামান, তাঁর স্ত্রী আর দু ভাইয়ের দু ছেলে—চারজনকে ঘর থেকে বের করে এনে মেঝিবাসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সোলজাররা খুন করে বোঝার ছেলেই জল্লাদদের স্ত্রী বন্যা খুনে ছুটে গেলেন। ছেলে, স্বামী দেওর, জা, খুনি ঘিরে দাঁড়াল। মফস্বল—তার ছেলের থেকে টানতে টানতে আমাদের করে নিয়ে এলেন। তখনো হাল ছিল। তিনি আমাদের সোফার ওপর পাশাপাশি বসিয়ে রেখে গেলেন।

ঘিন্ট ঘণ্টা পরে ফেরদৌস সোলজারদের নিয়ে এল। হিসেবে ভেদ না। ওরা আবার জোর করে ঘর ঢুকলো। অর্ধমৃত জল্লাদদেরকে পা ধরে টানতে টানতে আমার কাছাকাছি নিয়ে এল। আমিক ওদের খুলিমাখা দোষটা বন্ধুদের, নির্দিষ্ট ছেড়ে আইকে বাঁচিয়ে—ফেরদৌস বাঁচিয়ে। একজন জল্লাদের ছেলের পিস্তল নেড়ে ওরে নিয়ে একজন জল্লাদদের দিকে তাকালো। তাদেরটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল।

হয়ে গলার পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যায়। নাম কালীরঞ্জন। বাইরের পৃথিবীকে সে-ই খবরটা দেয়। রোকেয়া হলও বাদ গেল না। জলন্যানো আলুনের অধীনস্থ সৈনারা ছাত্রী হসপেটেলের ভেতর ছুটোছুটি করে পাখি ধরছিল। ৫০টি পাখি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে বাঁচলো। দর্শন বিভাগের প্রধান -৬৫ বছরের চিরকুমার জ্ঞ গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে সৈনারা হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে গুলি করল। আরও ৭জন অধ্যাপককেও একইভাবে শেষ করা হয়।

বিছানা থেকে টেনে তুলে ছিয়াশি বছরের অন্ধ বোসেফচন্দ্র ঘোষকে সৈনারা গুলি করল। ব্যাংকে টাকা রাখতেন না বলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিদের লক্ষ লক্ষ টাকাও লুটে হল। মেডিক্যাল কলেজ ওরা দখল করেছিল অনাতাবে। বাজুতা থেকে সোলা ছুড়ে।

দ্বিতীয় টার্গেট। রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান পুলিসের সদর দফতর। বাঙালী পুলিশরা আত্মসমর্পণ না করে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে ধরল। ১১০০ পুলিশের সবাই শেষ। ট্যাংক ব্যারাকগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে তবে থামল। সৈনারা বড় ক্লান্ত। একটু উৎসব চাই। ফুর্তি চাই। গ্যাসোলিন ছিটিয়ে হকেট ছুড়ে মোটা সদর দফতরকে তখন আগুনে লাল করে ফেলা হল। ভোর পৌনে পাঁচটা। ঠিক তখন ঢাকার অন্যেকদিকের আকাশও লাল হয়ে উঠেছে। ইকবাল হল, জহুরুল হল দিখা তুলে জ্বলছে।

রাত ১২টা ২০ মিনিটেও ফোন করে জানা গিয়েছিল শেখ মুজিবর রহমান বাড়িতেই আছেন। পরে একজন প্রতিবেশী জানান, রাত ১টা ১০ মিনিটে একটি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া গাড়ি, এক লরি সৈনা গুলি ছুড়তে ছুড়তে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে যায়। তিনি ফুলবারান্দায় বেরিয়ে এলেন, 'আমি তৈরি। গুলি ছোঁড়ার তো কোন দরকার ছিল না।' ওদের মেইন টার্গেট জানতেন, তাঁকে না পেলে মিলিটারি নারা ঢাকা জ্বালিয়ে দেবে।

রাত ১টা ২৫। সব টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে।

রাত সওয়া দুটোয় ২৫ লরি সৈনা 'দি পিপল' কাগজের অফিস ঘিরে ফেলেছে। অফিসের তেতলা থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'বাঙালীরা এক হও।' সঙ্গে সঙ্গে শত শত রাউন্ড বুলেট সেদিকে ছুটে গেল। অবিশ্বাস্য নাটক।

আইয়াকি চীনে জাইলেন হয়ে শিলচর সোলজারদের সোফল পথ দেখিয়েছিল আমার সেবাবাহিনী পরিচালনা হয়ে। এটি জল্লাদদল। ছিয়ে ৩০ লক্ষ।

সামনের কাউন্টার খুব সরু। কৈলাস একটা ছোট মাইক নিয়ে চেঁচাতে লাগল, সেই চার
বিক্রয়প্রতিনিধি যার সঙ্গে একটা ছোট ফিল্ম গাড়ি রোহার্স থেকে লন্ডন দিয়ে ঘুরে গেল
তিন হিজড়ে লোক এখনো ছিলেন। একজন দোতলা ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল
এক করে লিপস অফিস জ্বলে উঠলো। কৈলাস হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠলো,
'নারায়ে তকবির। আল্লাহু আকবর। ওদের মাই ডীল লাল।'
সাংবাদিকরা হোটেলে আটক। বেরুতে বলেছে। মহাদেবের ঘরঘরে কণ্ঠস্বরে ঘোষণা
শুনে হাততালি দিয়ে ওরা ঘোষণা করেছে। বাইরে পুলিশদের ছুটোছুটি চেঁচামেচি দাঁত
কিড়মিড়। এরকম ঘরবের কাগজের যাঁড়ি। চৌহদ্দির মধ্যে। ঘন্টা সময়
এখন ঘুমের ভেতর ঘরে, মহাদেবকে ঘিরতে ঘুরে ঘুরে ঘিরে ধরে ভয়ঙ্কর
সাজেই ছিল বাজার এলাকা ভোর নাগাদ চলে যুদ্ধি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল
আগেনি। বাড় সকলে ঘুটোর মহাদেবকে ভোরের আগে একটা ফিল্ম শুরু ও
এরে মেশিনগান বসানো নাকে ঘ্রাণ ঘুলিয়ে ভালো করে নিল চারদিক
বাজার এলাকা। বাজারেটের কোঁচ ভোরবেলার দৃশ্য কি হয়
ইস্টারন্যাটিনেন্টালের এলাকে এলা ঘরের চৌহদ্দির সাংবাদিক সিডনি
সানরাইজ সব দেখছে পাচ্ছিলেন ভোরে ভোরের ঘুমে ঘুমে ভাল ঘরে ঘরে চোরের
মিছিল অবাধেসারে ঘুমন্ত মানুষদের চারিদিক চারিদিক সারা ঘুমের ঘরেরা ঘুমিয়ে

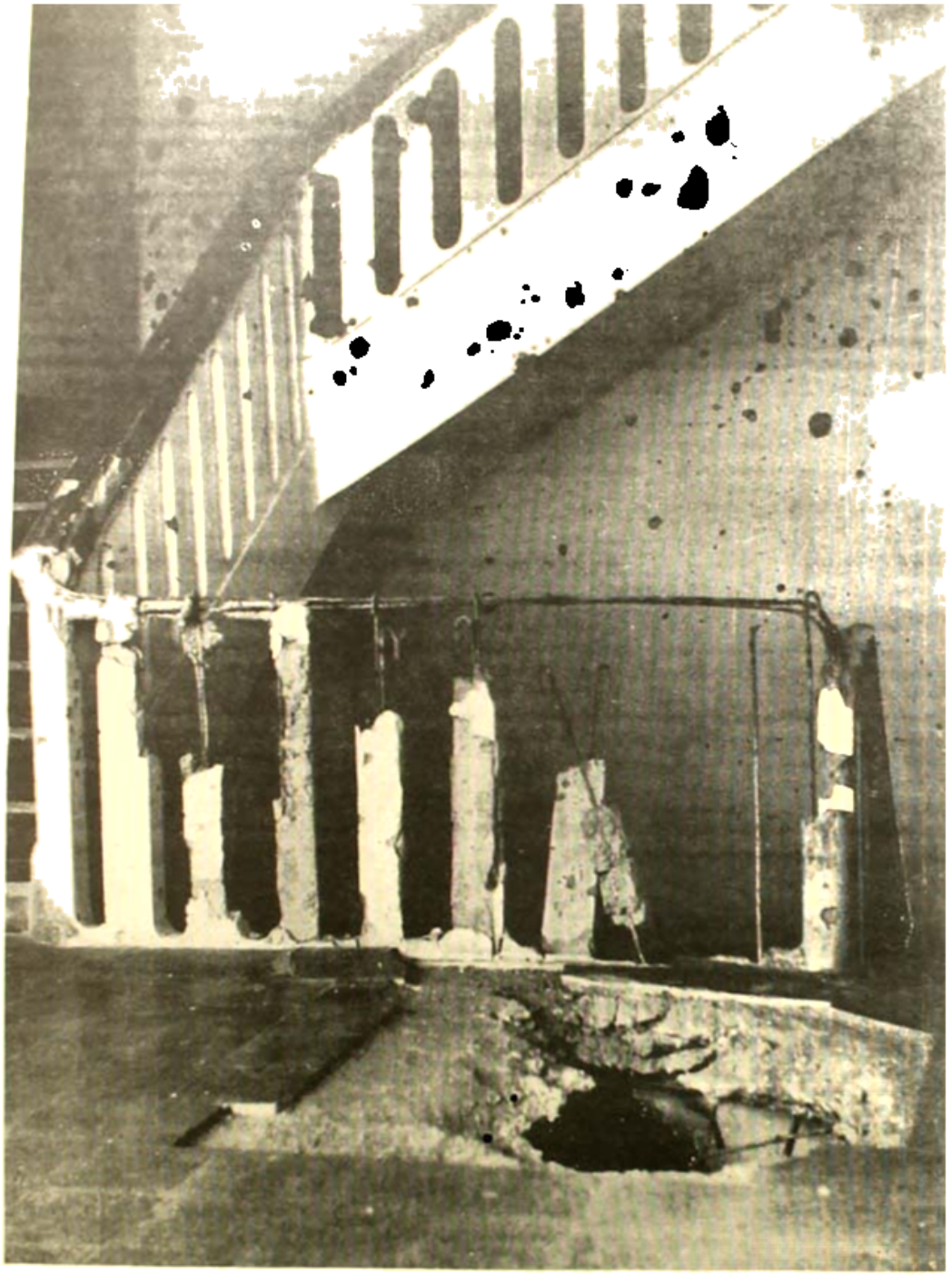

এলোপাথাড়ি খেলনা এসে পড়ছিল।
পরীক্ষা, বাসন, তরকারি, স্কুল
কিছুই বাদ যায়নি। কৈফিয়ত কে নেবে?
যে বেলার তিনি মিউজিয়ামের ভেতরে।
অনেক অনুনয়ের ফলে শেষ অবধি
ঘরে যেতে পেরেছি।
অবিশ্রান্ত ভেবে, দোতলায় এসে
স্নানাগার, মেঝেটায় ভেজাভেজা
দেয়ালে রক্ত এবং ঘুরতেদের
আওয়াজ কাইবে বেরোতে পারেনি।

জনা কুড়ি মুবক সব তুচ্ছ করে এসেছিল। মেসিনগানের মুখ সোজা করে ধরে ফেলল। ছোট ছোট দোকান, জোড়াতালি দেওয়া মাতৃর সব ধরে উঠল আগুনে। সৈন্যরা এখন ছাদে লাইট নিভিয়ে ফেলেছে।

প্রথম দলে একজন সৈন্য ইন্টারকন্টিনেন্টালে এল। বাংলাদেশের পতাকা টেনে নামিয়ে ছিড়লো। সুখ হল না। এখন এতে আগুন দিল। রাত সওয়া চারটে। হোটেল থেকে বড় বড় কাপ বোঝাই চা নিয়ে নিয়ে সৈন্যরা যাচ্ছে। আবহাওয়া বেশ বড় রকম নেয়েছে। ভোর ৫টা ২০ মিনিট ছটি ট্রাক টি-৫৪ ট্যাংক গড় গড় করে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকল খানিক। তারপর কামান উঁচিয়ে বড় রাস্তায় ছুটলো।

বৃহস্পতিবার খুবই ব্যস্ততা ছিল। ঘূর্ণি ঝড়ের প্রলয় ঘটলে বিদেশের জন্যে সেদিন আরও ভয়ঙ্কর হেলিকপ্টার নিয়েছিল। সেই চারটি কপ্টার বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার আকাশে খুব নিচু দিয়ে অনেকক্ষণ ওড়াউড়ি করেছিল। ঘরোয়াভাবে কোথায় কোথায় কাজ শুরু হবে তাই ঠিক করতে বেরিয়েছিল বোধহয়।

শুক্রবার সকাল ৭টায় বন্দী ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ঘোষণা শোনালো প্রেসিডেন্ট আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান করাচি পৌঁছেছেন। তিনি এক ঘন্টা পরেই বেতারে বলবেন। কিন্তু রেডিও ঘোষণার সময় কোথায়? রিপোর্টাররা আবার বারোতলার ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন। বাঙালীরা এবারও ভাঙাতে দিল না। বলল, বাইরে কি হচ্ছে জানি টানি না।

বুড়িগঙ্গার সদর ঘাটে টুরিস্টদের ছাদে সৈন্যরা মেশিনগান বসাচ্ছে। নদী পারাপারের জন্যে বউ মেয়েরা কাঁধে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়ালো। বুড়োরা চোখ তুলে সৈন্যদের দেখছে। তারপর কট্ কট্ কট্ কট্। গুলিবর্ষণ। একটুক্ষণ আগের চেনা মানুষগুলোকে সৈন্যরাই ঠেলে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিল। নিস্তব্ধ নিঝুম বেলা সাড়ে আটটায় কড়া পাহারায় ছুটো এম্বুলেন্সকে চলতে পথে ছাই রঙের স্যুট। নীল টাই। দিব্যি চটপটে। দু'জনে ব্রিটিশদূতাবাস দেখছেন। রিপোর্টারদের প্রশ্নের জবাবেই ছুটো সব শুনে বললেন আমার কিছু বলার নেই।

দিনের আলোয় শুরুতে ঢাকায় সৈন্যরা একটা ভয়ের খেলা খেলেছিল। এক এক এলাকায় ঢুকে এরা আগে ঢুকছে আকাশে বাঁধিয়ে দিচ্ছে। ফলে আগে পরপর পরপর বাসগুলোর সেই বোঝাই যাত্রীরা—আমি সবকে আকাশের দিকে সৈন্যরা চলতে চালাবার খেলছিল। শুক্রবার সকাল থেকেই এই খেলার শুরু। যাত্রীর বাসগুলো বন্ধ করলেই খুন হোতেই হেলিকপ্টার বসানো হত। ফলে এলাকাগুলোতে, রাস্তাঘাটে, বাড়ির বাসগুলো—এই ভয়।

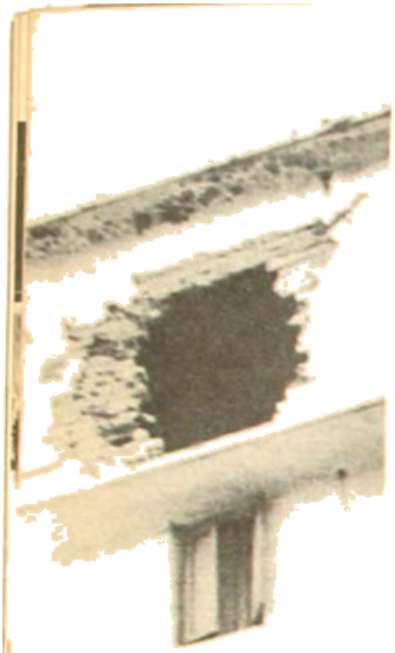

ঘুরে চলে যেতেই একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাংবাদিকদের বলল, তাড়া ভেতরে যাও।
হোটেলের ইনচার্জ সেই ক্যাপ্টেন আরও এক কাঠি। সে বলল, বিদেশী বলে রেহাই আসে না।
কথা শুনলেই গুলি। হোটেল মানেজারকে নির্দেশ, সকাল মিনিটের মধ্যে
লাইসেন্সটি দরকার টাঙাও। নইলে গুলি
সকাল নটায় ঢাকা বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৬ ঘণ্টার জন্য কার্ফু। না মানলে গুলি।
রাস্তায় বেরোও ৬টায় আর রাস্তায় শুধু সৈন্য আর সৈন্য। টাইট।
হোটেলের ৬৩৩টি ঘিরে সামরিকবাহিনী শুনছে সবাই। গুলির হিসেব দিতে হবে না।
হিসেব দিতে হবে না কাউকে।
পাশে, একতলার সাইকেল ঘিরে, ঢোকানোর যে রেজাল্ট ছিল সেখানেই পড়ে আছে।
নিখুঁত ঘিলু ইয়াহিয়ার এক একটি অদ্ভুত ছিন্ন লাশ। মুখের ভেতর আতঙ্কের
ছোপ সবাই ভেবেছিল স্বপ্ন। সব কটি মরা মুখে সেই দুঃস্বপ্নের ছাপ।
আলোয় পুরনো ঢাকার সৈনিকরা একটা মজার খেলা খেলছিল। এক এক এলাকা জুড়ে
ওরা বাতি ছাড়া প্রাক্তন বসিয়ে দিচ্ছে। এদের চালে সামলানো মানুষজন বেই
বেরিয়ে আসছিল অমনি শুরু হতো বসে সৈনিকরা ঢলাও চন্দমারি খেলছিল। শুক্রবার
সকাল থেকেই এই খেলার শুরু। লাইনি বরাবর সব রাস্তার দু' মোড়েই মেশিনগান
পেতে হয়। যেমন কালীবাড়িতে, নবাবগঞ্জে, বাবের বাজারে একই ফর্মুলা।
বেলা দশটায় ঢাকা বেতারে সামরিক আইনের কুটকচালি চলল খানিক। যেমন দফার ভড়োয়া।
কিন্তু কে শুনবে। বেলা বারোটা থেকেই সারা পুরনো ঢাকা সৈনিকরা হোলপাড় করে তুলল।

মৃত্যুর নিপুণ শিল্পী ইয়াহিয়ার এক

ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, সিটি বাজার—সব জায়গায় বাড়িঘর দোকান মাটিতে মিশিয়ে দিল ট্যাংক। সঙ্গে ছুটল ভিশ ফেকে দু' ঘরের জানলা দরজার গুলির ফোয়ারা। পেছনে আগুন ধরানোর দল। নেতানোর কেউ নেই।

একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। রিপোর্টাররা লেখেও খবর পাঠাতে পারছেন না। সব রাস্তায় ঘাতক সেনা দাঁড়িয়ে। আগের সেই লেফটেনান্ট কর্নেল আবার এল, রিপোর্টারদের বলল, রিলাক্স! সুইমিং পুলে সাঁতরাও। তখন বেলা সাড়ে বারোটা।

এই অবিরাম গণহত্যার ফোটোও সময় করে নিয়ে বিদেশী চাপতে লাগল একদল সোলজার ইন্টেকাব বাঙ্কারের অফিসে ফিরে ছাত্রির হল। সঙ্গে একটি পাটন ট্যাংক।

বহস্পতিবার রাত থেকেই সাংবাদিক সমেত বেশ কজন ফোরেন আছেন। বাইরে গুলি। প্রথমেই মেসিনগানের গুলি দিয়ে বাঙ্কারের নেমপ্লেট উড়িয়ে দিল সেনারা। তখন অফিসের মুখোমুখি পাটন ট্যাংকটা দাঁড়িয়ে। একজন সাংবাদিক উঁকি দিতেই দেখতে পেয়ে গুলি করলেন। হুমড়ি খেয়ে নিচে ঘুরে ফিরে এলেন তিনি। বাইরে কি হচ্ছে দেখতে গিয়ে ক্যামেরা বন্ধ লুটিয়ে পড়ল।

এদিকে পাটন খানিকটা পিছিয়ে তিন মিনিট ধরে মেসিন ঘুরে গোলা ফেলল। তারপর ৪০ মিনিট সময় নিয়ে অফিসের পেছনের দিকে পৌঁছনো গিয়ে। সেখান থেকে রুশপাতের টেবিলে গোলা। কিছুক্ষণ চুপচাপ। সৈনারা ফোনে ছুটতে ছুটতে ভেতরে ঢুকছে। আগুন ধরে উঠল। তবু রুশপাতক সিরাজুদ্দিন বেরোবেন না, ঘরের বাঙ্কারের অফিস পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ। এখানে না বাঁচলে কোথাও বাঁচব না। কিন্তু আর তাঁরা ফিরলেন না

একটি অপূর্ব ফ্রিজ শট

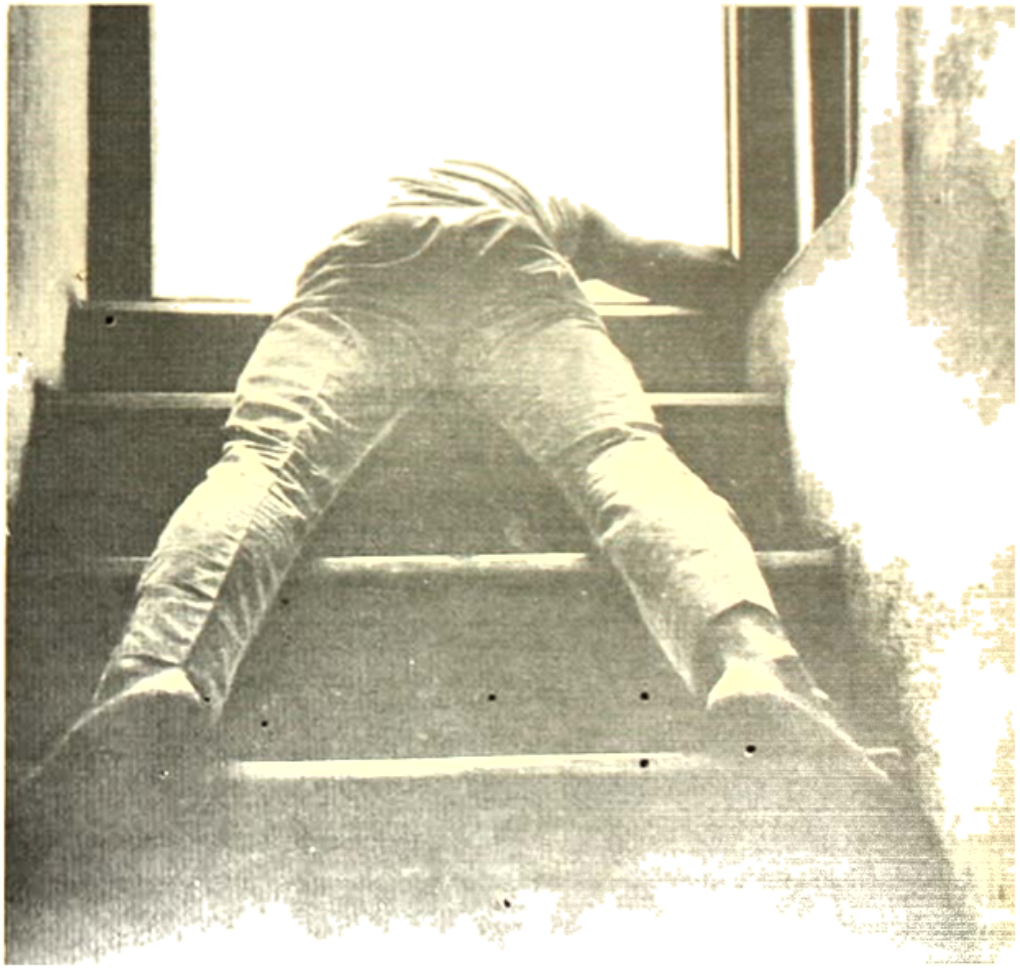

চাপ বাড়ছেই। পেছনের দিকে অল্পবয়সীরা কাঁধের ওপর পায়ে পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষের তৈরি মই বানিয়ে ফেলল। কবি ইকবাল হোসেন এই মই বেয়ে নামতে পারেননি। তাঁর লম্বা দেহ পরে পাওয়া যায়।

নেমে এসেও সবাই দেখলেন মিলিটারি রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে। তখন আবার সবাই একই ভাবে ওপরে উঠলেন। মোশন ঘর জমজমে। বেরোবার কোন পথ নেই। এমন সময় পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক আর তাঁর ছেলে জানলা গলিয়ে একখানা বাঁশ ঠেলে দিলেন। সেই বাঁশ ধরে ঝুলে ঝুলে সাংবাদিক জুলফত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

সন্ধ্যে ছটায় মিলিটারির জনসংযোগ দফতরের কর্তা মেজর সিদ্দিকি লালিক বিদেশী রিপোর্টারদের ফোনে জানালো, পঞ্চাশজন ছাড়া বাকি—আপনারা চলে যান। সেই রসিক লেফটেনান্ট কর্নেলটি আবার এল, গম্ভীর, বিনা ভূমিকায় বলল, আমরা চাই তোমরা চলে যাও। তোমাদের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। একেবারে মরিয়া—

পুরনো ঢাকা হঠাৎ জেগে উঠেছে। ছুটন্ত জিপের দুধারে ঘুলিয়ে ওঠা। হাজারে হাজারে মানুষ সকালবেলাই পরে ছোটে যাওয়া হয়েছিলেন। যে করে হোক নরক থেকে বেরোতে হবে। কিন্তু ফেরোবার পথে পথে মিলিটারি দাঁড়িয়ে। আবার ধোঁয়া।

ট্রেসার বুলেট ঢাকার আকাশ আলোয় চিরে ফেলছে বার বার। আগুনে, অন্ধকারে সারা শহর কখনও হয়ে পড়ে আছে। নিরাশ্রয়, নিরস্ত্র মানুষের কেউ এ-গলি সে-গলিতে লেপটে পড়ে আছে। টোকে কিংবা জিপগাড়ি চলে গেলেই আবার ওরা ছুটছে। জানে না কোথায় যাবে।

শুক্রবার রাত সওয়া আটটা। কুড়ি ঘণ্টার ওপর পঁয়তাল্লিশজন বিদেশী রিপোর্টার ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটক। এমন সময় সবাইকে বিমানবন্দরমুখো মিলিটারি ট্রাকে তোলা হল। করাচি চালান দেওয়া হবে। আগে পিছনে কড়া পাহারা দিয়ে সাংবাদিকদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বাইরে ঘুটে ঘুটে অন্ধকার। কার ভরসায় যাচ্ছে হুঁশ। বেতারে জাতির (!) উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ ভাষণ। রিপোর্টারদের শুনতে হল। ব্রাইডিয়ার কার্টিসেন—আলমার আলায়কোম্...শেখ মুজিবর রহমানস্ অ্যাকসন ইজ অ্যান্ অ্যাট এন্ড।

যেভাবেই হোক রবার্ট কেলরকে ওরা পায়নি। খানিক পরে তাকেও পাকড়াও করে এয়ারপোর্টে চালান দিল। চাঁদ ঘরে পড়ে আছে। এখানে ওখানে এক এক মহল্লা ঘরে জ্বলছে। পথে পথে ব্যারিকেড্। জিপ চলছিল সোকওয়ালা এক তরুণ ক্যাপ্টেন। খুব মেজাজী গলায় বলল, উই উইল কিল দিস পিপল্।

রাত সাড়ে এগারোটা। প্লেনের দেখা নেই। টাইপরাইটার, ক্যামেরা, ফিল্ম—এমনকি বউয়ের লেখা চিঠিও ওরা কেড়ে নিল। রাত আড়াইটে অবধি প্রায় উলঙ্গ করে তল্লাসি। ওরা একটা জিনিসের জন্যে মরীয়া হয়ে খুঁজছে। বাংলাদেশের পতাকা। রাত তিনটের পি আই এর ৭০৭ জেট প্লেন এসে দাঁড়াল। এয়ারপোর্টের একজোড়া এইমাত্র প্লেট ভর্তি সোলজার নামিয়ে দিয়ে এসেছে। ওরা সব কেড়ে নিল। কিন্তু কোন রসিদ দিল না।

ধুঁয়ে বলল, করাচি পৌঁছে ফেরত পাবে!

শুক্রবার শেষ রাতে সৈন্যরা যখন ক্লান্ত। বেল লাইনের দুধারে বাঁশের ঘর। আগুন নীচু করে না-চুকলে লাগবে। রাইফেলের ডগা থেকে ছোরা ঝোলার ঘুটে গেল। পাখির বাসায় সাপ ঢুকে পড়লে ডিম ফুটেও নাকি ছানা ছুটে পালায়। মেশিনগান অগেই সাজিয়ে মিলিটারি বসে ছিল।

ঠিক চোদ্দো ঘণ্টা পরে শনিবার বেলা বারোটায় ক্লান্ত যাত্রীরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেল। যাবার আগে ওরা কেউ কেউ একটি বিচিত্র খেলা খেলেছিল। পথে যাও বা দু চারজন চলছিল—আসলে পালাচ্ছিল—তাদের তল্লাসি করার ইচ্ছে হলেই সৈন্যরা মুখে বাঁশি দিয়ে হুইসেল বাজাচ্ছিল। বাঁশি শুনলেই থামতে হবে। না থামলে গুলি। সেদিন সব সোলজারই মিউজিক্যাল চেয়ারের রেকর্ডার।

এলাকাবাসীর পরিবেশ রক্ষা।
লক্ষ লক্ষ ঝুঁকি বাংলাদেশের
পথে ঘাটে ঘরে ঘরে
হাটে পথে, জনপদের ভিতরে ভিতরে
নৌকোর কারিগরা ছিটিয়ে
ছোট বড় নানান মানুষ
বেঁচিয়ে পরেছে নিরাপত্তার খোঁজে।
পরনের ধরিত্রে দেয় ঘরে
প্রিয়তমা দুরেরা একটি পথে
ছিন্নছত্রে নৌকোর সারি।
জনপদের দিকে
পাড়ি দেবার জন্যে।

৪

অন্ধকার থেকে আলোয়

এক শকুনের মুখ
থেকে পালিয়ে
শিবিরে পৌঁছবার আগেই
বহু শরণার্থী
আর এক শকুনের
খাদ্য হয়ে গেল

কোটি মানুষের ক্ষুধা মেটাতে গেলে রোজ কোটির

শিশুরা আজ কারুরই দুশ্চিন্তা নয়।
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তবু ওরা ঐতিহ্য হারাচ্ছে চোখ বাঁচিয়ে
দলে দলে চলেছেন আত্মহত্যার সন্ধানে। ঠুকরে এই
মহামারীর ভয়ে আর্থে বুঝে আসছে ধীরে ধীরে
বালিকা, শ্রমিক ও অজস্র চেনাজানা মানুষের দল। আর চলছে
পথের দুধারে মেয়েদেহ নিয়ে ব্যবসা লাভের চুক্তিও

অধিক টাকা চাই

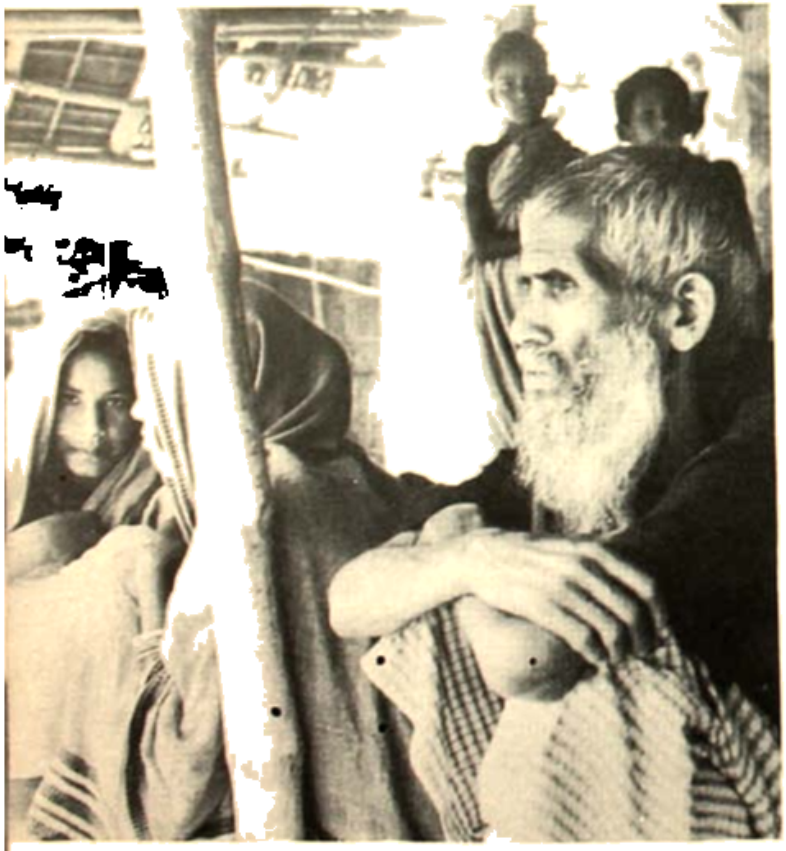

কেন বৃষ্টি বন্ধ কিছুই জানে
প্রতিবন্ধক নয়। পাট ক্ষেতের কোল ঘেঁষে
ছেঁড়া চালের ভিজে ছাপড় শুকোতে শুকোতে
কেউ পথের ক্লান্তি দূর করতে
বিড়ায় নিয়ে ছাপ্পা ভরে লাগাচ্ছে।
মুখে আশাহত জীবনের চিহ্নগুলি।

এরফান অলি চাকা ক্ষেতার শুনেছেন। শরণার্থীদের হালের বলদ, চাষের জমি, মাছের পুকুর, দোকান ঘর, বসতবাড়ি সবকিছুই অন্যায়ী আর ভাগেদারদের মধ্যে মিলি করে দেওয়া হচ্ছে

৯ মাসের বর্বর

উষাণ-পহেলার মধু ইতিহাসের
মাঙ্গী পরশের পুলোকন এই
মুখ। কেড়েছেন ইবেরু এলা, মেল।
শুকনো হল কেলার ফেল।
কেড়েছেন মানুষের উষ্ণতা মানব।
ইতিহাসের ওলসী বর্বরতা।
দেখার সব শেষে। এখন আছে
কেবল বিকৃতমনের জীবনের
দীর্ঘশ্বাস স্মৃতিখানি।
উপরে
নিচে কেন এবা নিচে পাঁজরে
চেতনের আরো মধু মুখের ছবি,
জীবন্ত, বিভোর, বিষাদময়।
পাশে
নৈরাশ্যের উপরে নিচে
মানুষেরাদের কেড়ে খাওয়ার
বন্ধনময় যন্ত্রণায়।

দিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান সাহাবুদ্দিন এক সম্বর্ধনায় সেদিন বলেছেন- খুন, অগ্নিহানী, ধর্ষণ, নিগ্রহ সব মিলিয়ে মর মাসের বর্বর শাসনে বাংলাদেশে মোট সাত লক্ষ নারীর জীবন নষ্ট হয়েছে। ১২ জুলাই বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, সমগ্র বাংলাদেশে মোট তিন কোটি মানুষ গৃহহীন, ঠিকানাহীন

শাসনে বাংলাদেশে মোট ৭ লক্ষ নারীর জীবন নষ্ট

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা,
মেঘালয়ের শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি এত
মানুষ গো, কোথা ও কোথা ও—
কোনও মেঘালয়ে, কিংবা শিলাক্তপুরে
শিলিগুরাসীর সাধ্য কী কুলসাংমাকে ডাক্তারি করে। তবু
তাইতে ভেতর সত্যকার্মাগুলি ঠিক
ঠিকমত পরীক্ষা হয়ে যেত

৮২,০২৬ তাঁবু
আর ২৪ হাজার ত্রিপাল
সংগ্রহ করা হল,
নানা জায়গার শিবিরে
এই সব ভাগ্য-বিড়ম্বিতদের
আশ্রয় গড়ার জন্যে

বন্যার পানিতে ঘেরা ছোট্ট ঘাসে মানুষ দিয়ে চলেছে বৃক্ষরা। অনেক বৃক্ষরাও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ অনাহারে এখানে আছে মৃতপ্রায়।

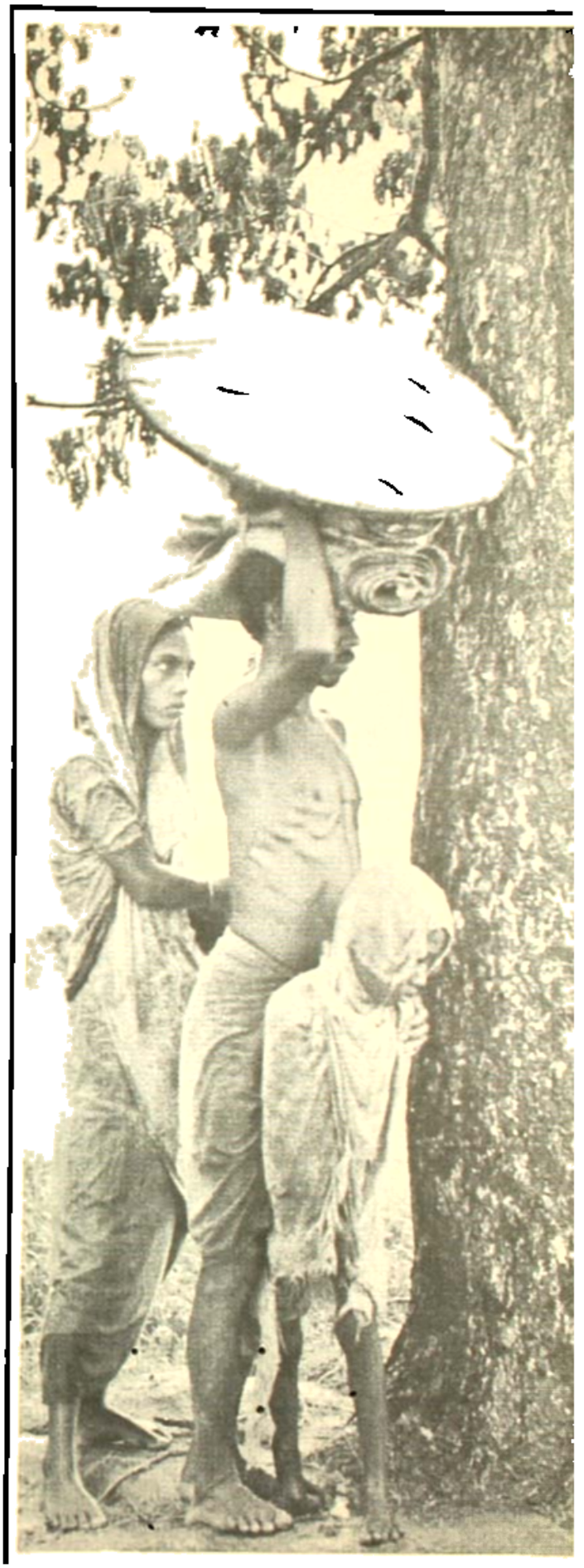

সবকিছুর ওপরের আটটায়। অন্ধকারে যেন ঝলসে।
হাজারে হাজারে মানুষ ছুটে আসছে ওদেরই দিকে আসতে
ও আড়ালের খোঁজে। হাতে যেটা ধরতে পারে, মাটিতে যেটা
হাতে নাগালে পাওয়া যায় সেটা দিয়েই। পশ্চিমবঙ্গ আসছে
ছিন্নমূল মেঘালয়ের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে।
ওরা দিনের পর দিন
সব চলা বন্ধ করে আবার আত্মরক্ষার জীবন ফিরিয়ে
নিচ্ছে। নতুন করে। মানুষের ভিড়ে, বেঁচে থাকার ঘুরে যায়
ছাতের নীচে ফেলের ভিড়ে, খোলা ঘর সীমান্ত ফোলবাড়।
পাঁচ ভাই বোন একটা মাদুরে শুয়ে শুরে যায় দিনের আলোয়।
নাগরিক জীবনের ছন্দ ছোটে সেই বাবা। হাহাকার
হাতে নিয়ে ক্ষুধার্ত ফিরিয়ে দেবার এরাই ভিন্নমূলের চিন।

প্রয়োজনের তুলনায় বাইরের

তাঁবেশ্বার ভাষা লেভার
তখনো বলে চলেছে—
তারতে শরণার্থী শিবির
আসলে নরক। কাঁটাতারে
ঘেরা বন্দী শিবির

সাহায্য সমুদ্রে গোষ্পদ

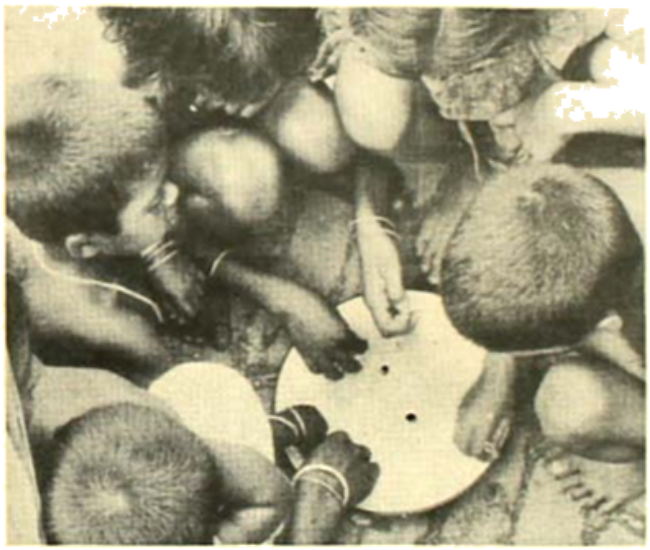

ইয়াহিয়া বেমালুম

অস্বীকার করতে চেয়েছিল এদের

বিদেশী সমাজকর্মীদের কাছে ভাষা সেদিন

'কাসো', ব্যাপকসংখ্যক 'অক্সফাম' ভারত সেবাশ্রম সংঘ—দেশী-বিদেশী কোন সেবাপ্রতিষ্ঠানই পিছিয়ে ছিলেন না। বিদেশী সমাজকর্মীরা বাংলা-দেশের শরণার্থীদের হাত দু'খানি ধরে তাঁদের দুঃখের শরিক হতে চাইছেন

বাধা ছিল না

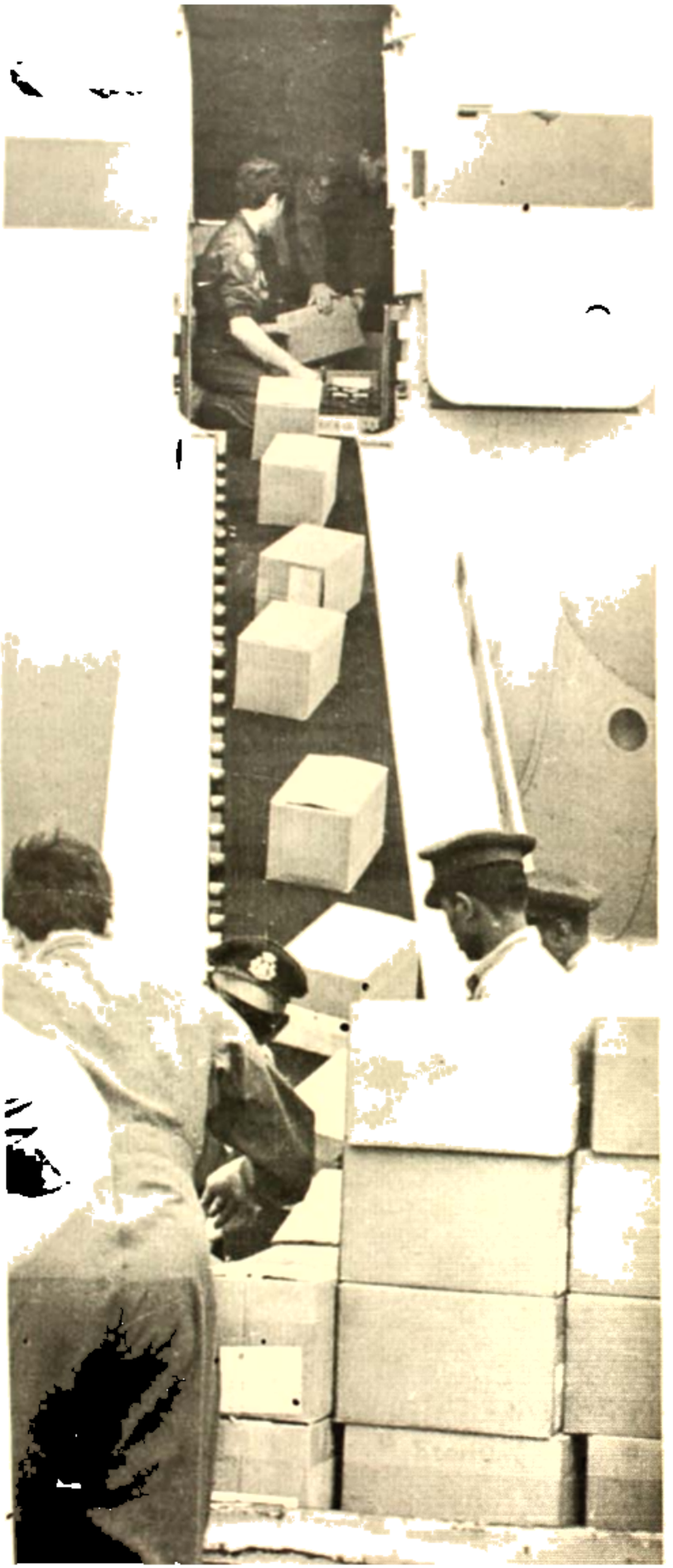

ভারত সরকার হিসেব করে বলেছিলেন, শরণার্থীদের সবাইকে মার্চ মাসের মধ্যে বাংলাদেশে পাঠানো অবধি ব্যয় দাঁড়াবে ৩৭১ কোটি টাকা। শরণার্থীরা যখন স্রোতের মত নিরাপত্তার আশায় ভারতের মাটিতে এসে আছড়ে পড়ছিলেন তখন ভ্যাটিকান সমেত ১৭টি দেশ মিলে, জিনিসপত্রে মোট ৭১ কোটি টাকার সাহায্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে হিসেব নিকেশ করে দেখা গিয়েছে, ওই প্রতিশ্রুতির শতকরা মোটে ৩৮ ভাগ শেষ অবধি এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ১৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মত। এই টাকায় শরণার্থীদের মোট দশ দিন খাওয়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রতিশ্রুতির ঘোষণাগুলি যেভাবে কাগজে কাগজে প্রচারিত হয়েছিল—প্রতিশ্রুতি রক্ষার এই বিপুল ফারাকের কথা কিন্তু সামান্যই প্রকাশ হয়েছে

পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে ব্রিটিশ এম. পি. আলোচনা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা প্রতি ক্ষেত্রে জানতে চান যে বাংলার বেশী লোক, মুসলমান না হিন্দু। তারা এ ব্যাপারে বাংলাদেশ

সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উদ্যোক্তা বিভাগের চেয়ারম্যান মিঃ ফিলিপ ডেভিস ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ডিপুটি স্পীকার মিঃ হেনরি ডেরিংটন-এর নেতৃত্বে সদস্যদের একটি দল এসেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতে। তাঁরা ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুগোস্লাভিয়া ও পাকিস্তান সফর করেন। তাঁরা ঢাকায় আসেন ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। ঢাকায় তাঁরা ছিলেন মাত্র ৩ ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ডঃ কামাল হোসেন, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মুনতাসীর মামুন, ডঃ আবদুল মোমেন চৌধুরী, ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী, ডঃ আবদুল মজিদ, ডঃ আবদুল মুকিত চৌধুরী, ডঃ আবদুল মুকিত চৌধুরী, ডঃ আবদুল মুকিত চৌধুরী

লবণহ্রদে বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের আশ্রয়ে

নিরাশ্রয় নল-মানবদের একেবারে মুখোমুখি

সাহারা আর লবণহ্রদের শিবির ঘুরে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সাদরুদ্দিনের মালুম হল সমস্যা কি বিরাট। ফিরে গিয়ে জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি লন্ডনে বললেন, প্রয়োজনের তুলনায় বাইরের সাহায্য সমুদ্রে গোষ্পদ।

বন্দী ঢাকা শেতাঙ্গের ঘোষণা মোতাবেক—শিবিরে কাঁটাতারের বেড়া ছিল সত্যি। কিন্তু এত মানুষের শৃঙ্খল, সহাস্য সমাবেশ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কোথায় কবে আর ঘটেছে?

আগস্টের গোড়ায় সেনেটর
কেনেডির সঙ্গে এসেছিলেন
শরণার্থীদের পুষ্টির অবস্থা
নিরূপণের জন্যে বিশেষজ্ঞ। তাঁর
হিসেবমত দিনে অন্তত ছ'হাজার
করে শিশুর মৃত্যু হওয়ার কথা।
তা ঘটেনি। ওষুধ তৈরির
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আগাম
ওষুধ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।
কলকাতার মেডিক্যাল ছাত্ররা,
তরুণ চিকিৎসকরা শিবিরে
শিবিরে ঘুরেছেন। অনশনে আধো
মেদেক্স ফিল্ড হাসপাতালে
রাজস্থানের ডাক্তার ফরিদপুরের
তরুণের আছ থেকে পাক-বুলেট
মেয়ে সরে অসাধ্য সাধন করেছেন

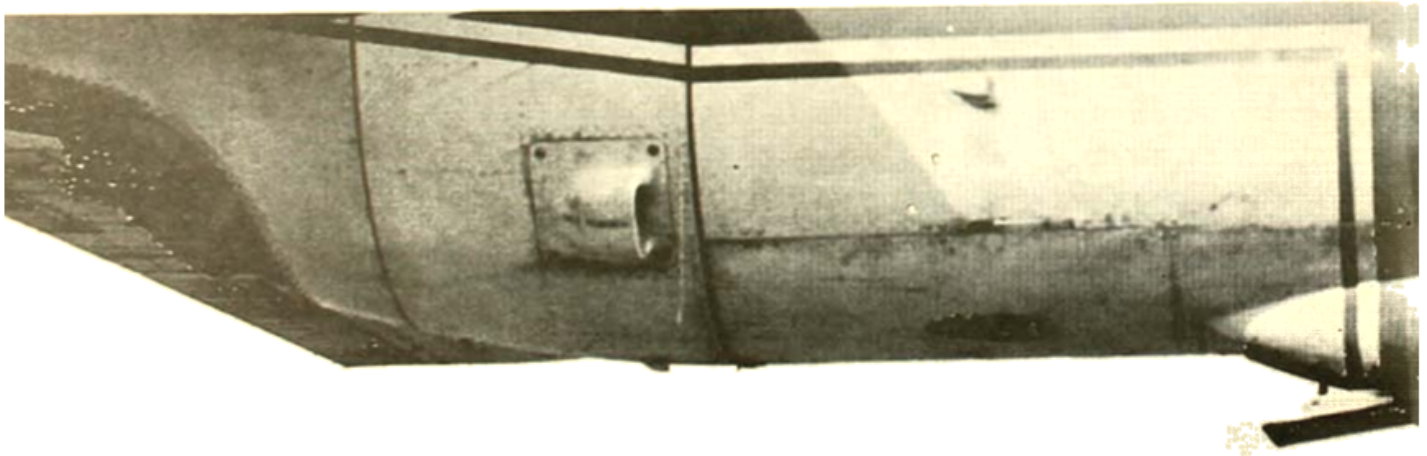

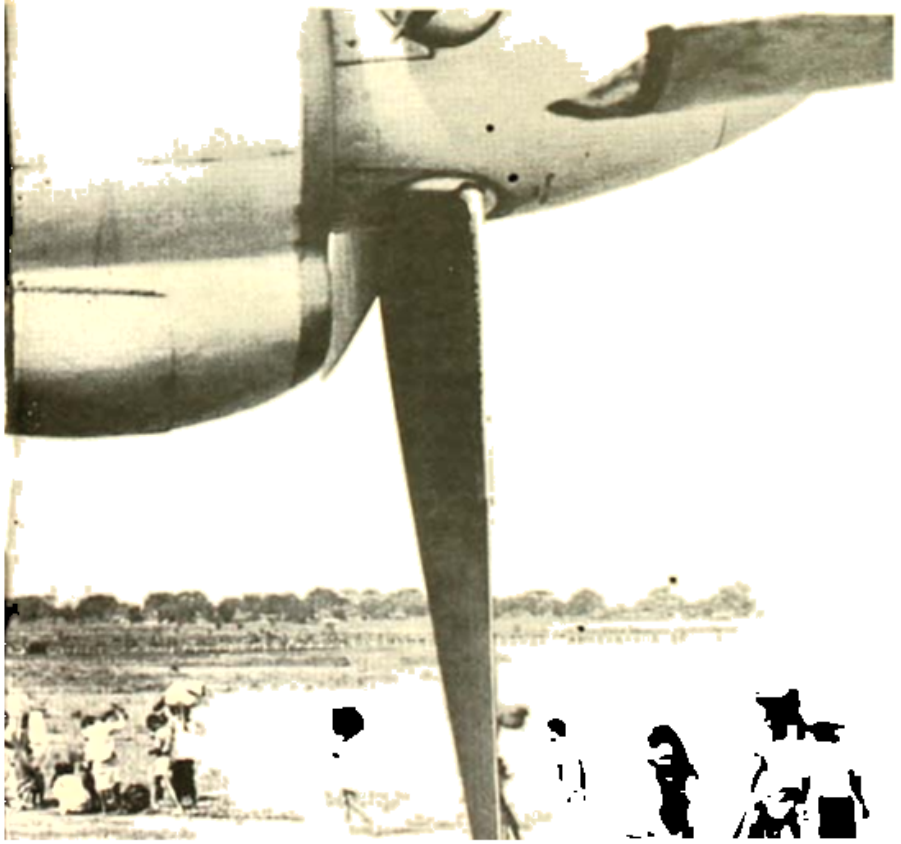

এক একটি মানুষ এক একটি দুর্গ

লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পথে পড়ে [illegible]। সেখানে পাক সেনাদের হেড কোয়ার্টার। বছর পঁচিশের সুঠাম তরুণ ডিস্ট্রিক্ট ১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনারেলদের নিয়ে সেখানেই বৈঠকে বসেছেন। মুজিব [illegible] করে ছাড়ার একটা পাকাপাকি সমাধান চাই।

কথা বলতে বলতে আহত বাঙালীদের মন চেঙ্গিজের চেলা সদস্য বাহিনীর বাঙালী নিচ্ছিলেন কবজায়। কিন্তু খাঁচায়র সেই কুট মতলব সফল কোন বাঙালীকে টুকতে দেওয়া হয়নি।

ভারত স্বাধীন না হলে এরা কোনদিন ডিমোক্রেসীদের বেশি হতে পারবেন না। স্বাধীনতা সর্পে মাত্র কয়েক বছরে ফাঁকা মহলে জেনারেল হয়ে মাথা বিগড়ে গেল। তাদের মার্কিন মুলুক থেকে খয়রাতির কমান, বিমান টাংক পেয়ে আরও তোলমাল হয়ে গেল। ওরা তাই সহজ সমাধান বের করলেন। বাঙালীদের সাবড়ে কর।

নিজের কোতল-কাণ্ড চালু করার আগেই আহত বাহিনী হয়ে গেলেন। ফেরে গেল খাঁচায়র প্ল্যান। বাঙালী সাবাড়ের সেই শীতল সম্ভাবনা ইয়াহিয়া মজলে মজলে পালন করলেন। রক্তের সুবেগে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে উঠছে। ইয়াহিয়ার খাস সেই কুখ্যাত বৃহস্পতিবারের রাতে জিরো আওয়ারে নেমে আসার সময় বাংলাদেশেই পূর্বেপশ্চিম আর্মির সৈন্য পাওয়া সাড়ে চার হাজার ই বি আর ছিল। বাকি ৩১০০জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেদিন বাংলাদেশে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের লোক ছিল একুশ হাজার। এর ভেতর সাতশো ৪০জন অবাঙালী। বেশির ভাগ অফিসারও তাই।

আর পুলিস ছিল ৪০০০০।

ইয়াহিয়া ধাপে ধাপে এগোচ্ছিলেন।

১০ মার্চ। ১৯৭১ ঢাকার ই পি আর-কে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দেওয়া হল। পুলিসবাহিনীকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে খোদ কমিশনরের অফিসেও মারেই গুলি বিনিময়। ৩জন নিহত।

আই জি তসলিমুদ্দিন ডিস-আরম্ড করতে অস্বীকার করলেন। পিস্তল অ্যারেস্টের সব গুলে অবজার দিল—ক্যাস। এ যে মিউটিনি।

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের সময়েই দেখা গেছে প্রেসিডেন্ট ভবনে পাহারারত ই পি আর শুধু লাঠি হাতে আর পাক আর্মির সোলজাররা অটোমেটিক রাইফেল।

মুক্তিবাহিনী

বাঙালীরা আওয়ামী-ইয়াহিয়া কোম্পানিকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। আন্দাজও করছিলেন। তবুও কিছু আসল—এ আর চাপা ছিল না। ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনের বৈঠক থেকে জেনারেল পিরজাদা বেরিয়ে গেলেন। ২৫শে মার্চ রাতেই প্রায় মুহূর্তে চট্টগ্রামে টেলিফোনে টেলিফোনে জানাতে লাগলেন—

আক্রমণ আসন্ন। শিগগির প্রচারে কান দিও না। কিছুতেই অস্ত্র জমা দেবে না। পালটা লেগো। স্বাধীনতাই আমাদের শেষ স্লোগান।

এর আগেই ১১ মার্চ তিনি করনেল ওসমানিকে দিয়ে ই বি আরের বাঙালী অফিসারদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তোয়া প্রস্তুত থাকো। ১৯৬৯-এর জুন মাস থেকেই লেফটেনান্ট ই বি আর, ই পি আর পুলিসবাহিনীকে এই রকমই একটা পরিস্থিতির কথা বলে আসছিলেন।

আগে ঠিক ছিল ২৪ মার্চ সিগন্যাল ব্যাটেরা কাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু ইয়াহিয়া যাতে করাচি পাড়ি দিতে পারেন সেজন্য নরমেধ যজ্ঞের দিন-ক্ষণ চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হল। চট্টগ্রাম অতটা অপেক্ষা করতে পারেনি। ঘটনা নিজেই নিজের মত করে ইতিহাস হয়েছে। 'সোয়াইত' জাহাজ থেকে বাঙালী খালাসিরা ভারি কামান, গোলাবারুদের বাক্স নামাতে অস্বীকার করল। চট্টগ্রামের ধারপাল এ অ্যাডমিনস্ট্রেটর ফ্রিগেডিয়ার রাজমদারকে আগেই ঢাকায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরেই ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তাঁকে ৪জন অফিসার, ২০০ লোক দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের বেয়াদব খালাসিদের সামান্য মোতাবেক দুরুস্ত করতে পাঠানো হল।

কলম্বো বিপরীত। অন্যের সমেত মেজর জিয়া বন্দরে হাজার হাজার দেশদ্রোহিক বাঙালীর সাক্ষিল হয়ে গেলেন। এল এম জি-র নলদুলো ঘুরে গিয়ে ক্যানটনমেনটের দিকেই তাক করল। তিনি সম্ভবত জানতেন না চৈত্রের বঙ্গোপসাগরে করাচির ডেস্ট্রয়ার যাবার আর জাহাজটার তৈরি হয়েই ছিল। অয়ারলেসে খবর পেয়ে ওরা বন্দর লক্ষ্য করে আগুন বর্ষণ করতে লাগল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতর চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার ঘাটি ছেড়ে বাঙালীরা বিপ্লবী হলেন। নেতা মেজর জিয়া। কয়েক ঘণ্টার চট্টগ্রাম তার পায়ের নীচে। রেডিও স্টেশন দখলে।

একটি বিপুল নাটকের নানান অঙ্ক তখন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আপনাআপনি অভিনীত হচ্ছিল।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো মার্ডেজিং এক্টেম্পস বসন্ত কাল টাইমটেবিল মাফিক শুরু হয় ২৫ মার্চ। ১৯৭১। অধারাতে।

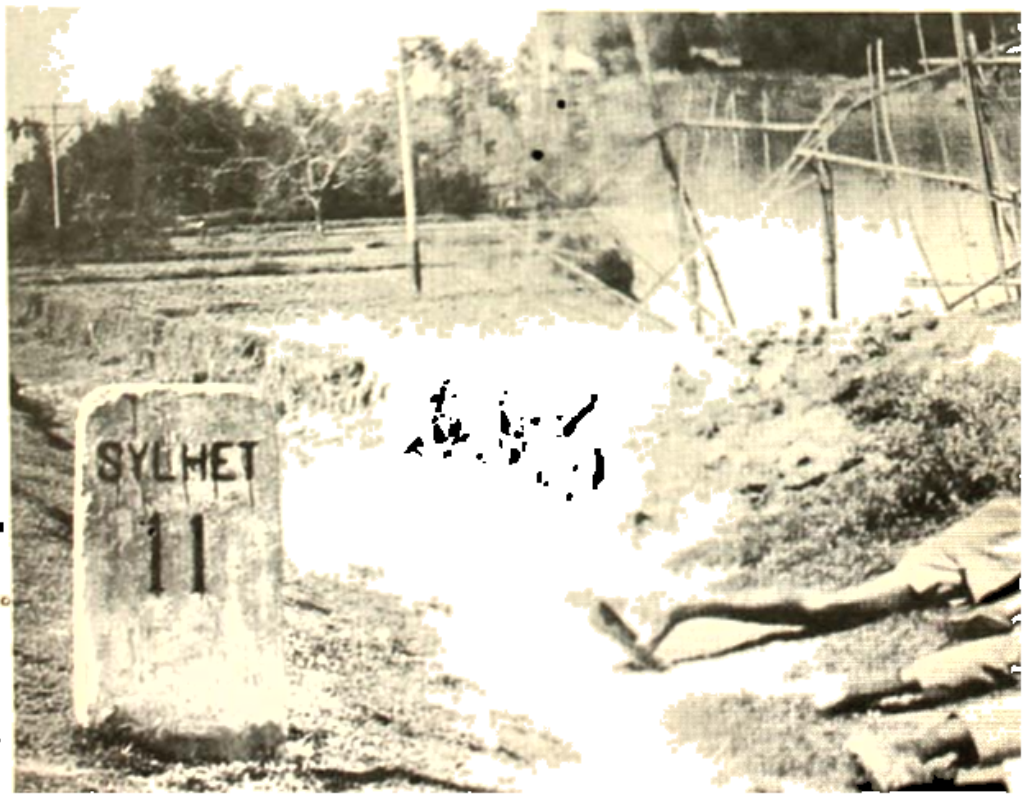

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনী মুক্তিযোদ্ধারাই ছিল। কিন্তু এই কথাটা অনেক বেশী রাজনীতি-সচেতন এবং চরমপন্থিক সমাজতন্ত্রবাদী। মুক্তিবাহিনী আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র লীগের কর্মীরা তো ছিলই, ও পিছিয়ে প্রগতিশীল বিশ্বে পড়ে ওঠে। এই বাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন অবশ্য বন্দরবন্ধুর আদেশে যেন অনুসরণ হয় যদি, অবশ্যই আদেশ প্রদান, ঘোষণাকে আহ্বান এবং আ. স. ও আহ্বান হয়। এই বাহিনীর খোঁজ পড়ল যখন বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সময়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বন্দরবন্ধু, বাংলাদেশের অসামরিক প্রশাসন নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং সমান্তরাল নিজের হাতে জারী করেন। এই নির্দেশ বলে পালিত হয় তার অবাধ্য করা, অসহযোগের আন্দোলন শুরু করা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ। দিনের বেলায় মুক্তিবাহিনী আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের মুখ সেক্টরগুলোর গ্রহণ করেন। মার্চ মাসের শেষ দিকে যখন পাকিস্তানী সামরিক জুন্টার অন্যতম উদ্দেশ্য আন্দোলন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন এই মুখ সেক্টরগুলোই গ্রহণ প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ছাত্র ও যুবকদের প্রাথমিক সামরিক ট্রেনিং দান শুরু হয়। ২৩ মার্চ টাঙ্গাইল জেলার আউটার স্টেডিয়ামে এই ছাত্র ও যুব সেনাদলই বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং মুক্তিবাহিনের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ অধারাতে এই মুক্তিবাহিনের গড়ে ওঠার উদ্দেশ্য নিয়েই, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকার

বিভিন্ন রাজারবাগে আক্রান্তকরণে রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং অন্যান্য স্থান ও শিক্ষককে হত্যা করে। কিন্তু স্থান ও মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণকারী নিহত হন। তারা নিরাপদ এলাকায় সরে যাবেন এবং নিজেরা নিরাপদ প্রৌঁছে গুরুত্ব করা হয়াও ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই. পি. আর-এর অফিসারদের সহযোগিতায় মুক্তিসেনাদের সংগঠিত করি হিসাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। মুক্তি-যুদ্ধকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা ছাড়াও এই যুদ্ধের নেতৃত্ব যাতে কোন ভীত ও চক্রান্তকারী মহলের হাতে চলে না যায়, মুক্তিবাহিনী সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। কোন চক্রান্তকারী মুখে যা বলের আওয়াজিতে মুক্তিযোদ্ধারা যাতে বিভ্রান্ত না হন এবং জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হন, মুক্তিবাহিনী সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন। সাধারণ ভাবে জনসাধারণের মন থেকে ভয়ডর দূর করা এবং মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সমর্থন নিষ্ক্রিয় করা—এ যুদ্ধের সময়ই মুক্তিবাহিনীর চলমান প্রাণ।

ডিসেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনীর হাতে সাড়ে পাঁচ হাজার তথ্যে বিশেষ ধরনের যোদ্ধা নিহত হয়ে ছিলেন। এদের আরও বেশি একুশ বছরের বেশী নয়।

তার আগেরটা আগে ঢাকার কাছাকাছি আধা-ক্যান্টনমেন্ট জয়দেবপুরে ই বি রেজের বাঙালী কর্তা কর্নেল রাকিবকে অফিসারস্ মেসে বাচ্চা পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন নাসির মুইদ্দির অস্ত্রম পেশটি এঁকিয়ে দিল। রাকিব আসলে এই ছোকরা ক্যাপ্টেনের পিতৃবন্ধু। কিন্তু তাতে কি? নাসির তখন 'অখন্ড পাকিস্তান' এবং 'সচ্চা মুসলমান' নামক দুটি কড়া নেশার ঘোরে পুরো মাতাল। অবলীলায় কোমর থেকে পিস্তল বের করে কর্নেল রাকিবকে শেষ করে দিল।

পিলখানার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের হক মাত্র প্রায় একই ভাবে অন্যদের ই বি রেজের বাঙালী প্রধান কর্নেল জলালুদ্দিন প্রাণ হারান। তাঁর পরের বাঙালী অফিসার মেজর ওসমান তখন চুয়াডাঙ্গায়।

রাকিব শেলেন। রইলেন মেজর শফিউল্লা। তিনি তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে লড়াই করতে করতে জয়দেবপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র পেলেন সঙ্গে নিলেন। ই বি রেজের মেজর খালেদ মুশারফ সন্ধ্যাবেলা তখন কি কাজে মনোনীত ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ছিলেন। ইয়াহিয়ার কবল থেকে সময়মত তাঁদের না পেয়ে বার্ষ হল।

টিক্কা খাঁ বেলিদের দেখতে পেত না বলেই ভেবেছিল তিন দিনে বাংলাদেশ ঠান্ডা হয়ে যাবে। প্রথম আঘাতে ঢাকা যখন প্রায় মাথা হুয়ে পড়েছে—ঠিক তখনই ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও স্বাধীন বাংলা বেতার' নাম নিয়ে ঈথার তরঙ্গে ভেসে এল। অনেক পরে ইয়াহিয়া খেতাঙ্গদের নামে যেসব নীরব মিথ্যা চালাতে চেয়েছিল—তার ভেতরে একটি সত্য কথা না করে পারেনি। তা হল—মার্চের শেষ দিকে চট্টগ্রাম কিছুদিন সামরিক কবলের বাইরে ছিল।

২৫ মার্চ মাঝরাত থেকে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন গুড়িয়ে দিতে দিতে পাক আর্মির রাত প্রায় ভোর হয়ে যায়। পুলিশ, ই পি আর, ই বি আর—যে যেখানে পেরেছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরে পড়েছে। অনেকেই ভেবেছিলেন—ইয়াহিয়া-মুক্তিফ মিটমাট হয়ে গেল বলে। ঢাকার হাওয়ায় তেমনি একটা গন্ধ চারিয়ে গিয়েছিল চারদিকে। তাই অনেকেই যুদ্ধের ভেতরে বাঙালকে আর জানেনি। অনেককে দেখা যায়- ২৬ মার্চে সকালে আবার ইটকে ক্যান্টনমেন্টে চলেছেন। তাঁদের খবর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

ঢাকা, কুমিল্লা, জলোরে পিলখি অনেকদিন ধরে ক্যান্টনমেন্ট বানিয়েছে। চট্টগ্রামে বানিয়েছে নৌঘাটি। সৈদপুরে সাঁজোয়া বাহিনীর আড্ডা। জয়দেবপুরে আধা সেনা ছাউনি।

এত করেও হোয়া বারবার বাদশাজাদার ভেড়া ভেড়েছিল টুটি। তাই অধিকন্তু ন দোষায়।

বাঙালী সাবধানের মুখে মুখে পানজাবী সৈন্যরা শ্রীহট্ট, বাহলাদেশ, বাঙ্গালাদেশ ও উচ্চারণ করে।

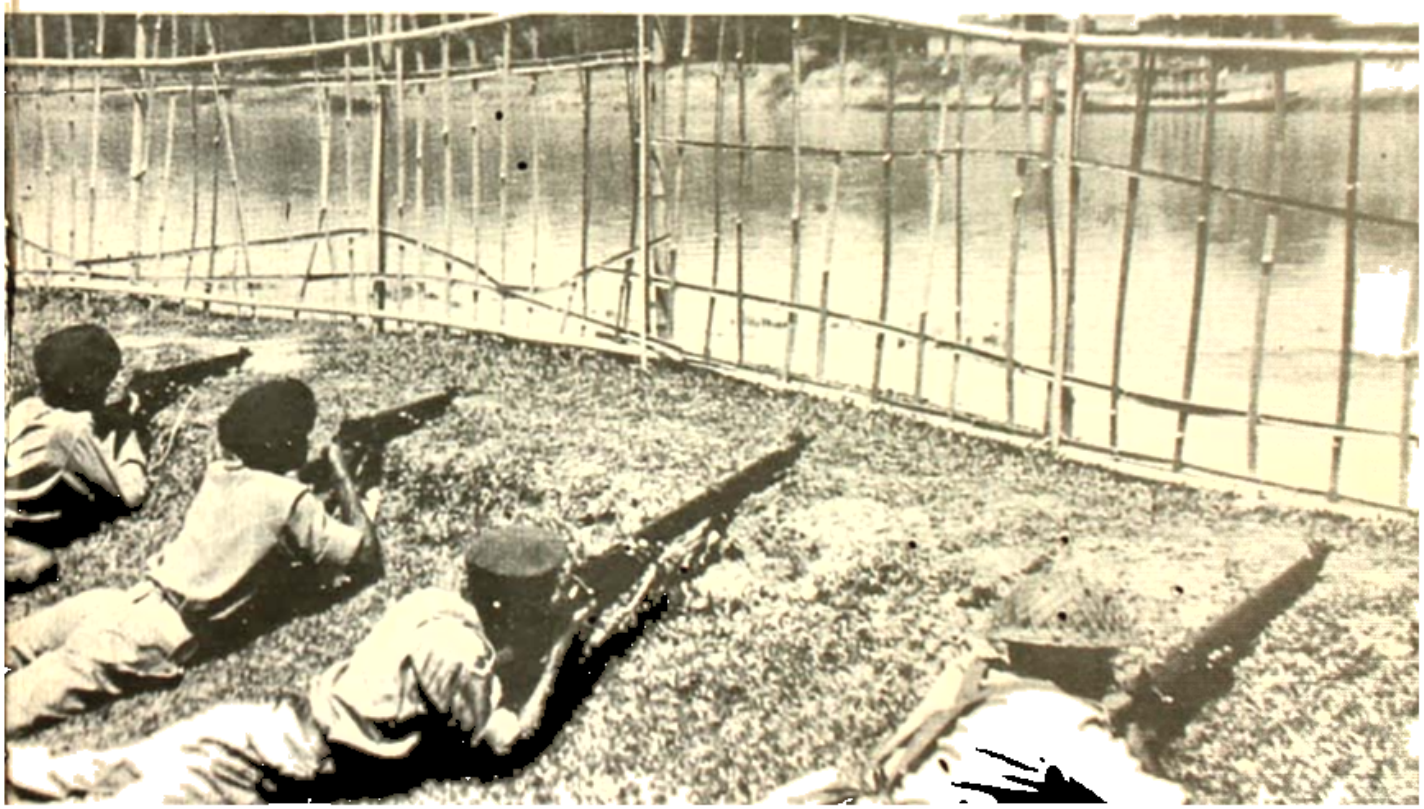

হাতেবোনা তৈরির ফ্লাস। লোহার টুকরো, টিনের কৌটো, পাট, শোলা, আসছের বোতল। কোন উপাদান ছিল না। এপারেটাস মারাত্মক এইসব সামান্য জিনিস নিয়েই সেক্টরকমের ফ্রেম বোমার, শিকিংয়ের চিত্র টাইমের সুপ্ল করতে হয়েছিল। উইক, মাচার, বাইকেল, আয়রন—কিছুই ছিল না সেখিন।

কাদের বাহিনী

কাদের বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীরই অংশবিশেষ বাঙালীরা বলে। এই নামের নেতার নাম কাদের সিদ্দিকী। আসল পরিচিত নাম চট্টগ্রামের সিদ্দিকী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে টাইগার সিদ্দিকী কিংবদন্তীর নায়ক। পাঁচশ মত কাদের এই তরুণ একদল তরুণ সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ পাকিস্তানের কিংবদন্তীর ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কাদের বাহিনীর অপারেশন ক্ষেত্র ছিল কুষ্টিয়ার অঞ্চল। এই এলাকায়

বাকুচিস্তানে নির্মম নিধনে নাম কিনে টিক্কা খাঁ বাংলাদেশেও নাম কিনতে চেয়েছিল। তার হাতে ছিল সাড়ে বারো হাজার পদাতিক। এক রেজিমেন্ট ট্যাংক। বিস্তর কামান, বিমান। কিন্তু তার ঘোড়ার মাফিক তিনদিনেই সব যখন ঠিক হল না—তখন জাহাজে—ঘোড়া পথে বিমানে লোক লস্কর, অস্ত্রশস্ত্র এসে পৌঁছতে লাগল। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে জাহাজ এসে ভিড়ল চট্টগ্রামে ১৮ এপ্রিল। বিমান এসে নামতে শুরু করল। টিক্কা খাঁ সার্কিট। যে চালকে নিজেরই নির্মূল করার ঘোড়ার দেখছিলেন তা মহীরুহের আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। আরও সৈন্য চাই, আরও অস্ত্র চাই। ঢাকা থেকে খবর গেল সিনসিয়ারে।

এপরিলের শেষ নাগাদ টিক্কা একেবারে মহাখুশী। নিয়মিত সৈন্য=৩৭৮০০। মিলশ নিরাপত্তা বাহিনী=২২০০০। ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড্ ফোর্স=১৭০০০। মুজাহিদ=৪৫০০। কামান=২০০। ট্যাংক=৮৪। সাবমেরিন চেজার=২০। নদীপথে মোলবাজির জন্যে=৬টি ব্যাটারি। নৌকে ছড়িয়ে পড়ল ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈদপুর, রংপুরে। বর্ষা নামতেই পাক বেতি সক্রিয় হয়ে উঠল।

এদিক সেদিক এলোপাথাড়ি মার খেতে খেতে এবং সুযোগ মত মার দিতে দিতে প্রায় দুই মাসের তিন ক্ষেত্র—পকিটিয়া, জিয়া, মুসাদেক—৬ এপরিল নাগাদ কুষ্টিয়ার ভেলিয়াপাড়ার চা-বাগানে এসে ওঁদের অপারেশনাল হেড কোয়ার্টার করলেন।

ওদিকে চুয়াডাঙা এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন মেজর ওসমান। মুসাদেক তখন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কুষ্টিয়া এলাকায়, জিয়া চট্টগ্রামে, পকিটিয়া সিলেটে।

এঁদের এবং অবশিষ্ট ই পি আর ও পুলিশকে ঘিরে আওয়ামি লীগের ছাত্র-যুবকের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরা জড়ো হতে লাগলেন। তাঁরাই জন্ম দিলেন নাতিদূর ভবিষ্যতের মুক্তিবাহিনীর বীজ। সেই হল শুরু। তখন ই বি আর সব মিলিয়ে হাজার তিনেক একত্র হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ই পি আর, পুলিশ মিলিয়ে আর ৭ হাজার এলেন। মোট দাঁড়াল ১০ হাজার।

নাটকের শেষদৃশ্যে তাকিয়ে দেখি—১৬ ডিসেম্বর—মুক্তিবাহিনী=৩০,০০০। তার ভেতর সামরিক ট্রেনিং পাওয়া নিয়মিত যোদ্ধা=১৮০০০। মেয়েলা যোদ্ধা=৪২০০০ (এর ভেতর বিশেষ ধরনের ট্রেনিং পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা=৩৫০০)। অবশ্য নৌবাহিনীর কমান্ডোদের সবসময়ই মুক্তিবাহিনী থেকে আলাদা করে রাখা হয়।

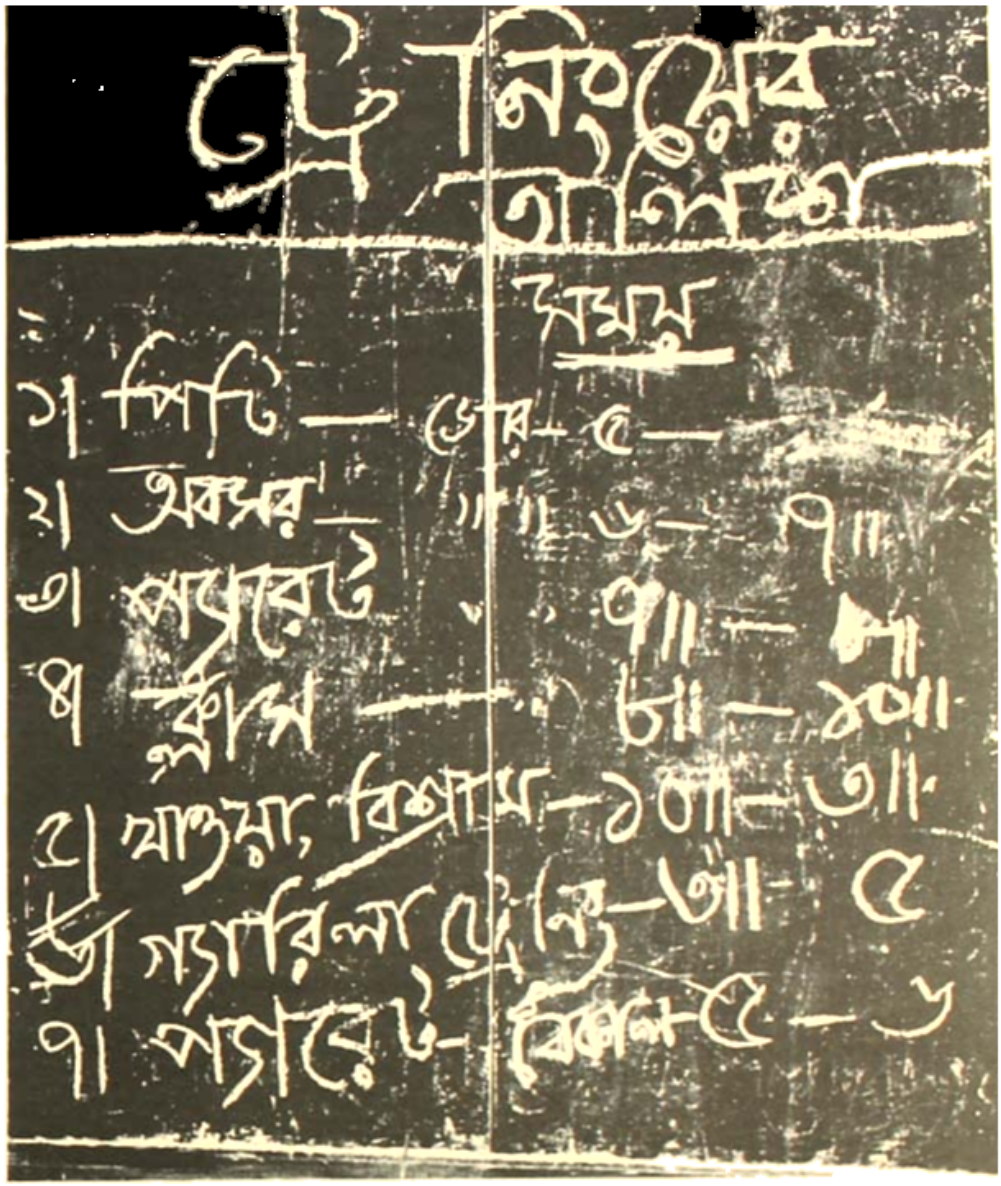

ফজলার বাহিনী কখনও তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সিদ্দিকী চকরা পাকিস্তানী আক্রমণের মুখেও তার এলাকা ছেড়ে সরে যাননি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে ছিলে গেরিলা, পালটা আক্রমণের সুযোগ পারিকল্পনা তৈরী করেছেন এবং তা কার্যকর করে শত্রুর কাছ থেকে ভারী অস্ত্র ও গুলী কেড়ে নিয়েছেন। তাদের বাহিনীতে ছিল দরকল যুদ্ধের, সকল মুসলমান এবং সকল শ্রেণীর লোকেরা। ডিসেম্বরে তার এই বাহিনীর সংখ্যা হাজার ছেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৮০০০-এ। এরা গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করে। তাদের বাহিনীর মূল পরিচালনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা কখনও অস্ত্র সাহায্য পাওয়ার আশায় বসে থাকেননি। ফজলার বাহিনীর উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করেছেন এবং অস্ত্র ছিনিয়ে এনে মুক্তিযুদ্ধে তা ব্যবহার করেছেন। তাদের সিদ্দিকী ভাই-জীবনে যুদ্ধের ছিলেন কাছেই ট্রেনিং করেছে। কিন্তু সামরিক জীবন গড়ন না হওয়ার আগেই কলেজ তিনি ছেড়ে দেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তাদেই গেরিলা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ময়মনসিং টাঙ্গাইল এলাকার নেতৃত্ব দিতে হয়। ডিসেম্বরের মাসে লক্ষাধিক নিয়ে সেনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী ময়মনসিং-টাঙ্গাইলের মুক্ত এলাকা ঘিরেই প্রথম চলা গেরিলাদের।

এপ্রিলে—মুক্তিবাহিনী সংগঠন অগোছালো গেরিলাদের দল এরা শুধু ছেলের বলে নিষ্ঠুরে নিষ্ঠুর পাক আর্মিকে কোথাও কোথাও একেবারে মুখোমুখি আক্রমণ করতে লাগল। অথচ পিনডির সোলজারদের তুলনায় এদের হাতে অস্ত্র বলতে কি-ই বা ছিল। কিন্তু তাতেই বেতনভুক সুশৃংখল সৈনিকরা শহরে শহরে আটকে থাকল—বাইরে আর বেরোতে পারল না।

মুক্তিযুদ্ধ স্বেচ্ছাসেবার। সর্বত্র সম্বর্ধনা প্রায় তছনচ। এই শূন্য অবস্থাকে ভরাট করে তোলার জন্যে মেজর জিয়া রবিবার ২৮ মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও থেকে অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করলেন। তার প্রধান তিনি নিজেই। মনোবল বজায় রাখতে সব ছেলেও বললেন, মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশেই এই সরকার—তিনি যেমন বলছেন তেমন কাজ হচ্ছে।

এপ্রিলের ১২ তারিখ মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। তার দুদিন পরে কর্নেল ওসমানিকে সি-ইন-সি করে যুদ্ধ কমান্ড গড়ে তোলা হল। কে কোন্ এলাকার কমান্ডার —তাও স্থির করে দেওয়া হল। তখনই এই বাহিনীর নাম হল মুক্তিফৌজ।

প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ এলাকাওয়ারি ঘোষণা করলেন:

শ্রীহট্ট-কুমিল্লা এলাকার কমান্ডার মেজর মঞ্জুরেফ, চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর কমান্ডার মেজর জিয়া, ময়মনসিং-টাঙ্গাইলের কমান্ডার মেজর লতিফউল্লা, খুলনা-কুষ্টিয়ার কমান্ডার মেজর ওসমান। এপ্রিলের মাঝামাঝি এই মুক্তিফৌজ ট্রান্সিতে অবতীর্ণ হয়ে পড়ল। কিন্তু তখনই গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ ভূমি তৈরি হয়ে উঠেছে।

নতুন জাতি জন্ম নিল

শনিবার। ১৭ এপ্রিল। ১৯৭১

সকালবেলা কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গাঁয়ের নাম বদলে গেল। নাম হল মুজিবনগর। বিরাট বিশাল বিস্তৃত আম্রকানন। সেই আম্রকাননে নতুন রাষ্ট্র—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জন্ম নিল। সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর স্বাধীন সার্বভৌম দেশ।

সেই বনস্থলে নতুন রাষ্ট্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘোষণা করলেন। পলাশীর আম্র কাননের মুখে ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। আজ সেই প্রাচীন জায়গার অদূরেক আম্রকাননের নীচে ১৯৭১ সালে সেই স্বাধীনতা ফিরে এল, জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

পুরোপুরি বাঙালী অনুষ্ঠান। সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন নিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বাংলায় জবাব দিলেন। নতুন রাষ্ট্রের ঘোষণাপত্রও বাংলায়।

অনুপস্থিত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর হয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অনুষ্ঠানের নাম বললেন। প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করলেন কর্নেল উসমানিকে। বিশ্ববাসীর কাছে চাইলেন কূটনৈতিক স্বীকৃতি, সামরিক সাহায্য।

শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান। উপরাষ্ট্রপ্রধান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করে যাবেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বললেন, আমি তাজুদ্দিন আমেদকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে মোশতাক মোসলেহুদ্দিন আহমেদ সাহেবকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছি। মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসাবে কর্নেল উসমানিকে প্রধান সেনাপতি এবং কর্নেল আবদুর রবকে চিফ অব স্টাফ পদে নিয়োগ করেছি। তিনি বললেন, হাটে বাজারে, নদীনালায় তারার সৈনিকরা লড়েছেন, লড়ছেন, লড়বেন। আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর।

প্রধান সেনাপতি কর্নেল উসমানিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সমাবেশের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতেই জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। প্রধান সেনাপতি বললেন, দরকার হলে আমরা বিশ বছর ধরে লড়াই করব। হতে পারে এযুগের ছেলেরা লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু পরের যুগের ছেলেরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। বাংলাদেশ যদি রক্ষা না পায় তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত গণবিক্ষোভ নষ্ট হয়ে যাবে।'

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আমেদ বললেন, পাকিস্তান ঘাতক ইয়াহিয়ার হাতে নিহত। মৃতের পাহাড়ে পাকিস্তান এখন শোকস্থান। আমরাই পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ জনযুদ্ধের রাষ্ট্র। বাংলাদেশের ১০ ভাগ আমাদের দখলে। হানাদারদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করার আগে মুক্তিবাহিনী থামবে না। কানটনমেনট ছাড়া গোটা দেশে আমাদের অধিকার বিস্তৃত।

মাত্র কয়েক মাইল দূরে শত্রুবাহক পাক বোমারু বিমান বোমাবর্ষণ করেছে। বাতাসে তখনো বারুদের গন্ধ। শত শত মুক্তিফৌজ, হাজার হাজার মুক্তিকামী জনতার মুখে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের সঙ্কল্প। ১৩০ বিঘার আম্রকুঞ্জ শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশ। মুক্তাঙ্গনের মঞ্চে কার্পেট বিছানো। স্বাধীন বাংলার পতাকাদণ্ডের সামনে সশস্ত্র মুক্তিফৌজ। কারেই যে বিধ্বস্ত জনপদ তা বোঝার উপায় ছিল না—যেন শান্ত বাংলাদেশেরই কোন নিভৃত নিসর্গ গ্রাম। বহু চাষী এসেছেন, এসেছেন বহু মহিলা।

অনাদিকালের বাংলাদেশের আদুল গায়ে সেইসব পল্লী বালকেরা সভার চারপাশে জড় হয়ে মনের সুখে ফোটোগ্রাফারদের ফেলে দেওয়া ফ্লাশ বালবগুলো কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বললেন, আজ না জিতি কাল জিতব। কাল না জিতি পরশু জিতবই। দেশের একখণ্ড জমিতেও শত্রু রাখব না। রাখব না। ইনশাল্লাহ—জয় বাংলা।

মে-জুন-জুলাই তিন মাস ধরে। একটি শিবিরে গেরিলাদের কড়াই রুটি ধরে ট্রেনিং দেওয়া হল গেরিলা আর নিয়মিত সৈন্য একসঙ্গে ভিন্ন শিবিরে ট্রেনিং পেল। গেরিলাদের পরপর দুটো ট্রেনিং শেষে জুলাইয়ের শেষ নাগাদ বেরিয়ে এল।

মনে রাখতে হবে, ঠিক এই সময় ইয়াহিয়ার রাজাকর বাহিনীও তৈরি হচ্ছিল। মোট ১২ হাজার রাজাকর তৈরি হয়েছিল। সাতদিনের ট্রেনিং দিয়ে নিরস্ত্র এদের বন্দুকের ডাণ্ডা দেওয়া হয়। মাস মাইনে ৭৫ টাকা আর ২০ কেজি চাল। অস্ত্রশস্ত্রের কথা তো নয়ই। পাশাপাশি মুক্তিফৌজের আসল বন্ধুরা ছিল অবাঙালিরা।

কর্নেল ওসমানি সেক্টরকমান্ডার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, প্রথমদিকে আমরা মুখোমুখি সংঘর্ষের কথাই চিন্তা করেছিলাম। সেইরকমই ছিল আমাদের প্রস্তুতি। আশা ছিল পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো এই অসম যুদ্ধ থামাবার জন্য সচেষ্ট হবে। বলবে পাকিস্তানকে হটে যাও বাংলা মুলুক থেকে। যখন তা হল না, আমরা আমাদের কৌশল পাল্টাতে বাধ্য হলাম। মে মাসের মাঝামাঝি আমরা গেরিলা যুদ্ধের পথ বেছে নিলাম। সম্মুখ সমরে না গিয়ে তখন আমরা কমান্ডো হয়ে গেলাম। জুনের শেষে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় সংসদে বিরোধী নেতৃবৃন্দকে বললেন, মুক্তিবাহিনী তৈরী হবেই।

এর আগে কি হত? কৃষ্টিয়ার একটি ঘটনা: সাবরে নেমে এসে ছোঁ মেরে বেশ কয়েক ১৮।১৯।২০ বছরের ছেলেকে বাইফোকাল চোখে করে বিমান থেকে গুলি ছুড়ছে বাধা দেওয়ার আর যে কিছু ছিল না সেদিন। এক সময় বুলেট ফুরিয়ে গেল

মহম্মদ ইমরান

২১ ডিসেম্বর। ১৯৭১। সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশের মনিরামপুর শহরে। ৩নং ২৫টা মুক্তিযোদ্ধা কৃষ্ণাগরের চর দেখছেন। ঘাঁটি থেকে চারে মাত্র ওরা ছয়জন ছাড়া অবশ্য সব ছিল না। চার দলের জন্যে এদের সবাই প্রতীক্ষায় ছিলেন। কৃষ্ণাগরের ২০০জন ছেলে বিশেষ করে মহকুমার মুক্তিযোদ্ধের প্রায় ৬০০ ছেলেরা সক্রিয় ছিলেন। মনিরামপুর মুক্ত করেছেন এই ছেলেরাই। এই ছেলেদের কৃষ্ণাগরের মনিরামপুর শহরের মুক্তে এক বিরাট অংশ নিতেন মনিরামপুর স্কুলের ছেলেরা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। বিপক্ষের মুখেও এরা চমকের ভয়ে ভয় করেছে। কৃষ্ণাগরের সময় সারাদিনরা সবাই ১১ বছরের এরা ছোট ছোট ছেলেদের ভয়ে নিয়ে এগিয়ে এল।

বলো, তোমার নাম মহম্মদ ইমরান। তুমি সাতক্ষীরা স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র। পাকিস্তানীরা যখন আসে তুমি স্কুলেই ছিলে।

তারপর আমি তিন মাস ধরে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আমিও এরকম ছোটবেলা। সহজে কারুর নজর করে ফেলতে পারতাম। অনেক চলতে চলে ওরা আমার ফিরে দিয়েছি নিজেদের নিরাপদ করেছে। ছেলেটি ফ্রকেরছেলের ছোটবেলা, ফেলেছে, বাবার, কথা মনে-মনে বাবার করেছিল।

সহজে মনে-মনে সবার ছেলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের ভিতরের সাথের আগেই প্রত্যেকদিনের ফেরত্তাদের ঘরে পৌঁছতে হবে। ইমরানটা এখন ওদের কাছে।

তখন বাহিনীর হাতে। সেসব জায়গায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিজেদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। যুদ্ধ জয়ের পাশাপাশি যাতে গড়ার জন্যে জোর ব্যবস্থাও নিচ্ছিল মুক্তিবাহিনী।

১১ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর জীবনে একটা বড় দিন। সেদিন ওদের প্রতিরক্ষার প্রায় নিয়মিত সৈনিকদের প্রথম দলটি ট্রেনিং শেষ করে বেরিয়ে এলেন।

ঢাকার তখন মুসোলিনী মেরিলাদের দাপট। সন্ধ্যে হলেই ওরা বেরিয়ে পড়ে। অক্টোবরের পনর তারিখ সবেক পূর্বে পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মোনেম খাঁর জবলীলা সাঙ্গ হল।

সেই পনর তারিখেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ খুব চিঠিতে জাতিসংঘের প্রধান মন্ত্রীকে জানালেন, বাংলাদেশের অর্ধেক আমাদের দখলে।

বোলাই বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করলেন, পাঁচটি মোটরবোট নিয়ে মুক্তিবাহিনীর নৌসেনা গড়ে নিল। তখন রোজ নতুন ইতিহাস ঘটছে। ১১ তারিখ বেপরোয়া মেরিলারা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাঁপিয়ে বোমা ফাটালো—নিরাজিকে জানিয়ে দিল—আমরা আছি, আমরা আছি।

ঢাকার সরকারকে রকটানির সবরকম রাস্তা হারাতে হচ্ছে। মুক্তিবাহিনী স্থলপথ, জলপথে সেদিন ইয়াহিয়ার সৈনিকদের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইবদর বাংলাদেশেরও খুব দ্রুত দাবাড় করা হচ্ছিল।

আকাশে বাতাসে মুক্তিবাহিনীর আসন্ন জয়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

অক্টোবরের শেষদিকে বাংলাদেশের থানাগুলোর শিকিভাগ মুক্তিবাহিনীর হাতে। চাকতের সঙ্গে মোট সৈনিকে তিনশো সাঁইত্রিশ চৌকির ভেতর

৬৪টি চৌকিতে নিয়াজি হাজার চেষ্টা করেও তার সৈন্য পাঠাতে পারল না।

১১ তারিখ ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার ব্লাড নিজেই বললেন, মেরিলা তৎপরতা অনেক বেড়েছে। ওদের সংখ্যা অন্তত ৫০ হাজার। তার ভেতর মেয়েরাও আছে।

অক্টোবরের শেষদিনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম একটা সুখবর ঘোষণা করলেন। মুক্তিবাহিনীর বিমানবহর গঠিত হয়েছে। তার প্রধান—গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকার।

নভেম্বরের বিকেলগুলো ছোট। রাতগুলো বড়। তাড়াটে দখলদার সৈনিকদের প্রতি রাতেই মনে হত—এ রাত বুঝি আর ফুরাবে হবে না। ভোরে উঠে দেখা যেত ফেরিঘাটগুলো নষ্ট করে রেখে গিয়েছে মেরিলারা। শহরের বাইরে সৈনারা বেরোতে পারে না। মেরিলারা সর্বত্র। অথচ নিজেরে উধাও। একেবারে ভোজবাজি। অথচ যা করার ঠিক করে যাচ্ছে।

গাঁয়ে গাঁয়ে নিয়াজির আদেশে পিটুনি কর বসলো। বোঝাই যাচ্ছিল,

গ্রামাঞ্চল হাতছাড়া হয়ে গেছে। দিনের বেলাতেও পাক সৈনারা বিরাট দল বেঁধে বেরোতো—সঙ্গে থাকতো আগুনে নেভানোর দমকল। তখনই ওদের হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছিল—ওরা অবসন্ন, ক্লান্ত। নিয়তি যে পরাজয়—তা ওরা জানতো।

মুক্তিবাহিনীকে ধরবার জন্যে, বম ফেলার সময় নিতে ইয়াহিয়া তার মামাবাবুদের জোর ধরল। যা ছুতো করে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক বসিয়ে যাও। কিন্তু সে চেষ্টা কাজে এল না।

চারদিক থেকে আটক পাক আর্মি তখন ঢাকার চারদিকের অনেকটি গ্রাম একদম ঘুরে ফেলল। সেদিন ছিল ৩০ নভেম্বর।

পাছে ছোপেবছে মুক্তিরা ছেকে মুক্তিবাহিনী খাস ঢাকার গলা টিপে ধরে—তাই নজরের সুবিধের জন্যে ৩০০ মানুষ আর কয়েকটা গ্রাম শেষ করে ফেলা হল।

রাস্তায়, রেলপথে ছিল নেই। ছোঁকতে সেনা পারাপার দেখলেই মেরিলারা গুলি ছুঁড়ছে। জলপথ তখন কণ্টকপথ। যোগাযোগ—রসদ—যাতায়াতের জন্যে পি আই এ-র বোয়িংগুলোকে ডাকা হল।

মেরিলারা সামনাসামনি লড়াইয়ে না গিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার নীতি নিয়েছিল। তখন ৩০ হাজার বোম্বার মুক্তিবাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানতে তৈরি। এই বাহিনীর বীজ—ই বি আর, ই পি আর পাক ভারতকে আগাপোড়া জানত। অন্য কোন মুক্তিবাহিনীর পক্ষে শত্রুর চরিত্র জানতেই বছর দেখে যায়।

মার্কিন সমরবাহিনীর ট্রেনিং পাওয়া সত্ত্বেও টুঁপ যাবার পাক আর্মির একটি বিশেষ দল ভোড়াতেই কাজে নামছে। এরা মুক্তিযুদ্ধের পালটা ব্যবস্থা নিতেই এসেছিল।

তারাই বিশেষ করে মরীয়া হয়ে অনেকের অনেকের রকমের প্রতিশোধ নিতে লাগল।

ইয়াহিয়া রাতারাতি দু ডিভিশন সৈনা তৈরি করল পশ্চিম পাকিস্তানে।

সারা বাংলাদেশ তখন ওদের কাছে শত্রুশিবির।

যেমন যেমন কাজ—তেমন তেমন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের। বেস ক্যাম্পে

ক'দিনের ট্রেনিং দিয়ে সেখান থেকে বাছাই করে বিশেষ বিশেষ ট্রেনিংয়ে ছেলেদের পাঠানো হত। বয়স সবার আঠারো থেকে তিরিশের ভেতর। সবাই প্রায় শিক্ষিত। ফলে ট্রেনিং সবচেই দেওয়া যেত। সুশিক্ষিত ছেলেদের নিয়ে তৈরি মুক্তিবাহিনীর মত এত শিক্ষিত বাহিনী পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ।

২৪ নবেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বাংলাদেশের বিরাট এলাকা মুক্ত করেছে। পাকবাহিনীতে বহু হতাহত হয়েছে।

প্রাক্তনমন্ত্রিসভার পর অবোরকে নিবাচি বলেছিল, আপনাদের আর্মাকে মুক্তিবাহিনী ভোর মত পিটেছে।

নবেম্বরের শেষে ইয়াহিয়ার চাহি মধুসূদন বলে ডাক ছাড়ার অবস্থা। শ্রীহট্ট শহর অবরুদ্ধ। কলাবের পরপার মুক্তিবাহিনীর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে।

'সিলেট—৪'

আমার বাড়ির দেখা ছিল শহরে সবচেয়ে বড় খানবাহাদুর 'সিলেট-৪'। তার সেলুনে চলেছে কিন কিনটি মুক্ত শান্ত নৈঃশব্দ। আমরা তার ছিন্নিতর হলেন মুক্তাঞ্চলের কবে। সিলেটের নিতে সেরী হল না। ফাইট একটা নিতেই হবে। আমার মুখে এগিয়ে আসতে পারছিলো। শহরে দাঁড়িয়ে মুক্তিবাহিনী।

ছেলে তখন ছাত্রী বাহে। কলেজের এক পরিচয়ন সেবেই নিবাচি ছিলেন। 'সিলেট-৪' তখন ছেলের জন্যে এসে গেছে। মুক্তাঞ্চলের মতো এল, এম, জি থেকে মুইলো স্টেন। 'সিলেট-৪'-এর ওয়ারলেস যন্ত্রপাতি তুলে নেয়া হলো। নিয়ত হল সামনের খানবে। কিন্তু সেলুনে থাকা। তখনও খাকা করছে মুইলো স্টেন থেকে। সেলুনের খানবাও নিয়ে হল। সামনের ও সেলুনের মুক্তি খানবে রাখিয়ে তার ছোর খানবের পাশে মধ্যে ফিল ছেড়ে করা করা হয়েছিল। বিশেষ 'সিলেট-৪'কে এবার পর্দায় ছেড়ে দিয়ে সেলুন দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সকাল ছটা থেকে বেলা ১টা অবধি বিরামহীন স্টেন চালিয়েছে পাকসেনারা। প্রত্যেকটি খানবাহে আর লক্ষে লক্ষে ফিল বিদেশীদের প্রতিকৃতি। এ-জাতীয় ছাইভেট ওয়ারলেস বাহিনীর প্রথম অস্ত্র। ছেলে কমপক্ষে পাঁচ হাজার মাইল। কিন্তু ফাইট হাজার মাইল পর্যন্ত আমাকে হয়েছে সহে। পাকসেনাবাহিনীর স্টেন ঘোলার প্রতিবাদের প্রত্যক্ষদর্শন ছলাপাতে ছেলে পড়ছিল। ফলে ভাঙা পড়ে গেল। মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্য কিন্তু ছাইভেল, স্টেন এল, এম, জি— তাও আবার একসঙ্গে মুক্তিয়ে এল ঘোলাবাহিনী। ভয় পেয়েছিল। কিন্তু আমার আমার বাহে দেখা দিয়েছে নতুন খানবাহ। ভাবছো বাহে সেলুন থেকে স্টেনের মুখ লক্ষ্যই ছেড়ে ছিটাবেন। ঘুরে দেখা আমার পাকসেনার সমাপ্তাপ্ত, সমাপ্তাপ্ত নিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। ছেলে একটার মুক্তিবাহিনী নিয়ে এসেছে। সমাপ্তাপ্ত পাকসেনার নিয়ত। ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল, খুশমনু রহিমকর।

কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, ময়মনসিং—তখনও। নেভির ব্যাং ব্যাচকুমারেরা চালনা, চট্টগ্রামে
ডুব দিয়ে দিয়ে জাহাজ ওড়াচ্ছে। আর পাক আর্মি কিছু না করতে পেরে
ভারত সীমান্তে আঠার মত লটকে আছে।
অথচ তখন বাংলাদেশের ভেতরে শুধু মুক্তিবাহিনীর পাতাই স্বীকৃত।
তারপর পূর্ব, পশ্চিম—দুই রণাঙ্গনে ভারতীয় জওয়ানরা এসেছেন।
পূর্ব খণ্ডে অল্প সময়োপযোগী বাহিনী মুক্তিবাহিনী। সেই মতই তাজুদ্দিন আহমেদ,
সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর যোগাযোগ হয়। ঐন তারিখ রণাঙ্গনে অবিরাম
জনের ভেতর দিল্লির ঘোষণা।
পূর্বখণ্ডে দুই বাহিনী মিলে মিত্রবাহিনী। সেনাপতি লেফটেনান্ট জেনারেল
জগজিৎ সিং অরোরা। তখন মিত্রবাহিনী ঐপার চর ওরেও যেতে পারে।

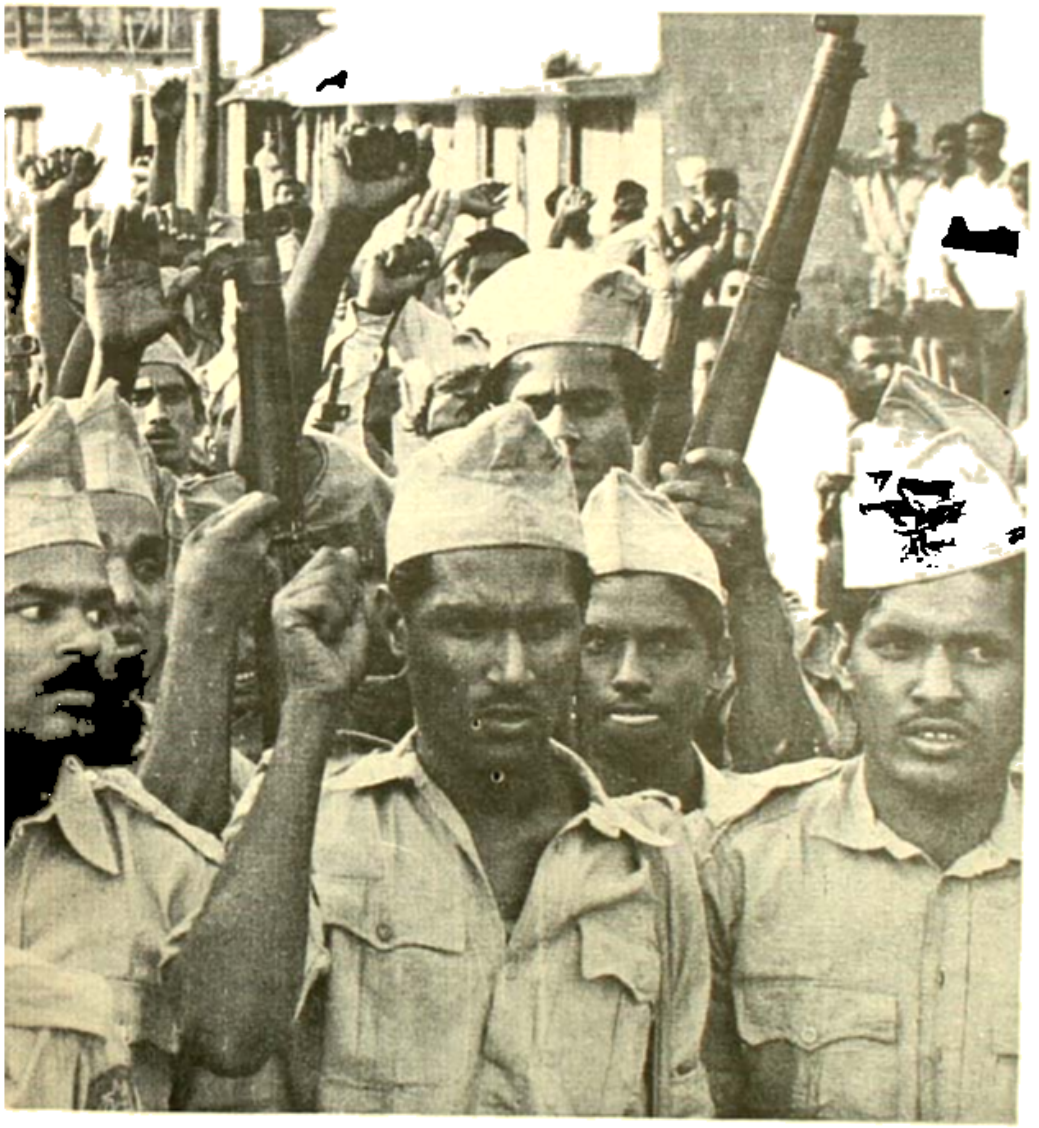

ভোরবেলা দুই করে কুষ্টিয়ার
চলেছেন ই পি আর। কুষ্টিয়ার দুটির
জন্য মার্চ। মাস তখন এপ্রিল,
১৯৭১। বাংলা অক্ষরে।
সকলে বাইরেল। তাদের পরে সবাই
অপরিচিত। শিবির শুধু স্বাধীনতা।

দেশে দেশে দূতিয়ালি

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ। শনিবার। লোকসভা বিতর্কে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রথম বলেন, আমরা পূর্ববঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। রাজনৈতিক সমাধানের জন্য শেখ মুজিবের বহুমানের ভূমিকাকে আমরা গুরুত্ব দিই।
ওই দিনই সন্ধেতে ভারতের বাহ্যবিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, পূর্ববঙ্গের নিহতদের সহানুভূতি। ৩১ মার্চ সন্ধেতে সর্বসম্মতে প্রস্তাব নিয়ে বলা হল, ভারতের সমস্ত জনসাধারণ পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জানাচ্ছে।
পরে নানা সময়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী যা বলেন, তার মর্মার্থ: আমাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থাই আমরা নেব। পিলুডিকে তিনি স্পষ্টই বললেন বাংলাদেশ রাজনৈতিক সমাধান করতেই হবে। বিশ্বকে চুপটি করে বসে থাকলে চলবে না তাকে এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করতে হবে।
এপ্রিল—কুয়েল এপ্রিল! স্বাধীনতা ঘোষণার পাকবাহিনী কামানে, বিমানে, সাঁজোয়া বহরে তখন। তার ভেতর পিকিং থেকে পিলুডিকে সমর্থন জানানো হল।
সেদিন ছিল ১ তারিখ। ২০ এপ্রিল আরও খারাপ খবর এল, তবু পিলুডিকে চরম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তখন ভারতের দিকে শরণার্থীদের ঢল নেমেছে।
মে মাসেই কূটনীতির পথে ভারত তৎপর হয়ে উঠল। এরই চেষ্টায় বৃটেনের বিদেশ সচিব পরিষদের বৈঠকে, তারপর হেলসিংকিতে সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সম্মেলনে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা ও শরণার্থীদের দেশে ফেরার উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উপর জোর দেওয়া হল।
শ্রীমতী গান্ধী সংসদে, জনসভায়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় এই কথাটিই বারবার বোঝাতে চাইলেন সামরিক নয়, রাজনৈতিক সমাধান শরণার্থীদের দেশে ফেরার মত নিরাপদ অবস্থা সৃষ্টি করবে। নির্বাচিত আওয়ামি লীগের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানই ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য।
শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে। পিলুডিকে ভারত নয়—শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের সঙ্গেই কথা বলতে হবে।
৮ মে ভারত সরকার বিশ্বের রাজধানীতে রাজধানীতে সংসদ সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতের বক্তব্য

নিত্যদিন কৃষ্ণ

গণহত্যার শুরু থেকে শুরু—প্রায় ন' মাস দেশে দেশে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোতেও নিত্য কৃষ্ণ হয়েছে। বিবেকের নির্দেশে। শুরু হয়েছিল এপ্রিলের গোড়ায়—দিল্লিতে পাক হাইকমিশনের দুজন বাঙালী ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেন। তারপর থেকে বল গড়িয়ে চলল।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে মুক্তিনগরে বাংলা নামে দেশের আনুষ্ঠানিক জন্মগ্রহণের পরদিনই কলকাতার ডেপুটি পাক হাইকমিশন নিজেকে ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাস বলে ঘোষণা করল। তারপর ক্যানবেরা, ওয়াশিংটন, কাঠমাণ্ডু, ম্যানিলা সর্বত্র এক কাহিনী। দূতের দিনগুলো প্রায় যখন ফুরিয়ে এসেছে—তখন দিল্লির পাক হাইকমিশন থেকে বাঙালীরা সপরিবারে নীচু দেওয়াল টপকে কম্পাউন্ডের বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। পারলেন না হুসেন আলী। সম্প্রতি তিন কন্যা সমেত আছেন হুসেন আলি বন্দী হলেন। কারণ, তিনি পাক গোয়েন্দাচক্রের পাণ্ডা আবদুল গণির ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী। অতএব হুসেন আলিকে ফেরাতে গিয়ে যে সব কর্মিবৃন্দের ফাঁস হয়ে যায়। প্রথমা তার দুই ছেলে—

হোসেন আলি

৮ বছরের মুরাদ, ৬ বছরের মুরশেদ বেরিয়ে এসেছিল। দিল্লির স্কুলের ছেলেরা ওদের সঙ্গে ওদের বাবা, মা, দিদিদের মুক্তির জন্যে হাইকমিশনের গেটে ধর্না দিল। তার একমাস পরেই ইয়াহিয়ার বিমান বোমা ফেলে ভারতের বহুত্ব দুঃখ চাপিয়ে দিয়েছিল।

তার অনেক আগে—

মঙ্গলবার । ৬ এপ্রিল । ১৯৭১

কে এম সাহাবুদ্দিন, আমজাদুল হক ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে পেলেন। পূর্ববঙ্গের মানুষ এই দুজন বিবেকের নির্দেশে দিল্লির পাক হাইকমিশনের কাছে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশের কাছে আনুগত্য জানালেন। তার সপ্তাহ খানেক আগে ওদের বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

সাহাবুদ্দিন, আমজাদুল হক নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই শেখ মুজিবর রহমানের অনুরক্ত। গভীর দেশপ্রেমিক এই দুজন মানুষ ষোলআনা বাঙালী। বিবেকের নির্দেশে ওঁরা যখন বাংলাদেশের কাছে আনুগত্য জানালেন—তখন ওঁদের বাবা মা ঢাকায়।

পাকিস্তানে বেতারে অবশ্য বলা হল, এই দুজন পাক কূটনীতিক নিখোঁজ হয়েছেন।

মুক্তিনগরে নতুন রাষ্ট্র নতুন জাতির জন্মের পরদিন রবিবার বেলা বারোটায় কলকাতার ন' নম্বর সায়কাস আধুনিকটির ইতিহাস সৃষ্টি হল। কলকাতার পাক হাইকমিশনের ভবন শীর্ষে দেখা দেল নতুন নিশান।

এই প্রথম একটি পাক দূতাবাস ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে

বুকিয়ে বললেন। শরণার্থীদের চাপ বাড়ছেই। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। মে মাসের মাঝামাঝি ভারত দুনিয়ার দরবারে সাহায্যের আবেদন জানালো। পরদিন সিনহুকে কড়া নোট পাঠিয়ে নয়াদিল্লি পরিষ্কার গলায় বলল, শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতেই হবে। শ্রীমতী গান্ধী মুক্তিকামীদের উস্কেদেন বললেন, বাংলাদেশ জয়ী হবেই। জুন মাসে বৃষ্টির ভেতর পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় শরণার্থীতে থৈ থৈ অবস্থা। তার ভেতর মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভারত বিশ্বের বড় বড় রাজধানীকে ভারতের বক্তব্য জানতে দূত পাঠিয়েছে। এ মাসের অন্যতম দূতঃ বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং। তিনি মস্কো, বন, প্যারিস, ওয়াশিংটন, লন্ডন ঘেলেন। পদগরনি, ব্রান্ডট, হিউম, হিথ্—সবাই বললেন, রাজনৈতিক সমাধান চাই। শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। ঝরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে রাজনৈতিক সমাধানের কথাই বললেন। কিন্তু রজার্স ও নিকলসকে সব বলেও স্বর্ণ সিং তাঁদের টলাতে পারলেন না। তবে তাঁরা মুখে বললেন, অস্ত্র সাহায্য তো পাঠাচ্ছি না। নতুন করে সিনহুকে আর অস্ত্র পাঠানো হবে না। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিউম ঘোষণা করলেন, অবস্থা স্বাভাবিক না হলে পাকিস্তানকে সাহায্য দেব না।

অধিকাংশ বৃহৎ শক্তি বিশ্বের এই ভূখণ্ডে শক্তিসাম্য অপরিবর্তিতই রাখতে চাইছিল। ওয়াশিংটনের চোখে 'ব্যাপারটা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার।' মার্কিন মহল আসল সময়ের না ছিরে শরণার্থী ইস্যুতে নানান প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে আসছিল। ওদের চোখে—বাংলাদেশ যেন ইস্যু, পুরো ব্যাপারটাকেই তারা ভারত-পাকিস্তান বিরোধের চেহারা দিতে চেষ্টা করছিল।

* এই উট পাখিরা যাতে চোখ মেলে বাস্তব অবস্থার দিকে তাকায়—সেজন্যে ভারত অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সর্দার স্বর্ণ সিং বিদেশ সফর সেরে সংসদে দাঁড়িয়ে জানালেন,
* আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দেবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।' তার ক'দিনের মধ্যেই নিউ ইয়র্ক টাইমস আমেরিকার বাণিজ্যিক ফাঁস করে দিল। ডলারের পরিহাস! সুস্কেহানা আর 'পদ্মা' নামের দুখানি জাহাজ বাজার থেকে সস্তা দরে অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছে। আরও জাহাজ বোঝাই হচ্ছে। শেষ অবধি শেষটাকল পাকিস্তানকে অস্ত্র বোঝাইয়ের কথা

সরকারীভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করল। জানিয়ে দিল, এটা আর পাকিস্তানী দূতাবাস নয়। প্রাক্তন ডেপুটি পাক হাইকমিশনার হোসেন আলি বললেন, এই হল বাংলাদেশ সরকারের দূতাবাস—এই হল আমাদের একমাত্র পরিচয়—আন্তর্জাতিক দুনিয়ার জন্য কোন পরিচয় আমাদের রইল না।

রবিবারই বাংলাদেশ মিশন অফিসে কেন্দ্রীয় হলঘর থেকে জিন্নার ছবি সরিয়ে ফেলা হল। সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ ইকবালের ছবিও। সেখানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের ছবি—কবি নজরুল ইসলামের ছবি টাঙানো হল। বাড়ির গেটে পাক হাইকমিশনের নাম-ফলক সরিয়ে দিয়ে সেখানে লেখা হল। বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন। হোসেন আলির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বললেন, গত কয়েকদিন ধরে এই বাড়ির বাগানে ঘুরেছি। একা একা কেঁদেছি। স্ত্রীকে বলেছি ইসলামাবাদে মরতে যাব না। যদি মরতে হয় বাংলাদেশে লড়াই করে মরব।

শনিবারও যিনি ছিলেন পাক ডেপুটি হাইকমিশনার—রবিবার সেই এম হোসেন আলি পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা তুললেন। সেদিন ছিল ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

রবিবার ভোরের দমকা হাওয়া দিয়ে ঝড় উঠেছিল। তাতে এতদিনকার পাক পতাকাটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। দূতাবাসের একজন কর্মী আরেকটি পতাকা ওড়াতে যাচ্ছিলেন। হোসেন আলি তাঁকে বারণ করে তাঁর হাতে বাংলাদেশের একটি পতাকা তুলে দেন। তারপর তিনি নিজে দড়ি টেনে সেই পতাকা উঁচিয়ে দিলেন।

কে এম সাদারুদ্দিন

কবুল করল। সঙ্গে সঙ্গে সদস্যরা মার্কিন দূতাবাসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ জানালেন। ভারত তার উদ্বেগ প্রকাশ করে পরিষ্কার বলল, পাকিস্তানেরআগ্রাসী ভূমিকা তাদের। আমেরিকা কর্ণপাত করল না। ভারত-মার্কিন সম্পর্কে চিড় ধরল। আমেরিকা বলতে চায়, অস্ত্র, অর্থ পাঠানো বন্ধ করে আমরা পাকিস্তানকে মৈত্রীসংঘের সদস্যদের দিকে ঠেলে দিতে চাই না। বরং অস্ত্র, অর্থ যুগিয়ে পাকিস্তানকে ধরে রাখার একটা সুযোগ আমাদের হাতে রাখতে পারব।

জুনের মাঝামাঝি ভারত সরকার আরব দেশগুলিতে একই উদ্দেশ্যে আরও দুটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বদানকে ভারতের বক্তব্য বুঝিয়ে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকরের রায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮ জুন ব্যাংককে পৌঁছলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আমেদ এবং সাইনাওয়াজ খান আরবের দেশে দেশে পাড়ি দিলেন। আমেরিকা তখনো জাহাজ বোঝাই করে পাকিস্তানকে অস্ত্র পাঠাচ্ছে। অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করতে ভারত সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো। কিন্তু ওয়াশিংটনের উঁচু পাঁচিল তাতে কান দিল না। ২৫ জুন অর্থ সচিব বললেন, ভারত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নিয়ে জানালেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করুন। একথা নয়াদিল্লিতে তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারকেও বললেন।

এতদিনে বিদেশে কূটনৈতিক তৎপরতার ফল ফলতে শুরু করেছে। জুলাই মাসেই ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানি পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য পাঠানো বন্ধ করল। আমেরিকা অস্ত্র পাঠানো বন্ধ না করে ততদিনে মাতব্বরির রাস্তা ধরেছে। জুলাইয়ের শেষদিকে ভারত পরিষ্কার বলল। পশ্চিমবঙ্গের দিকে সীমান্তে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক বসানোর জন্য মার্কিন প্রস্তাবটিকে অনিয়োচিত কাজ বলে গণ্য করা হবে।

ইয়াহিয়া শেখ মুজিবর রহমানকে ফাঁসি দেওয়ার কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। আগস্টের গোড়ার দিকে ভারতীয় সংসদের ৫০০জনের মত সদস্য মুজিবের প্রাণরক্ষার জন্য ঐ খানটের কাছে একত্রে আবেদন জানালেন। ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বের

হোসেন আলি নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানিয়ে বললেন, তাঁর অফিস ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাস।
তিনি শীগগিরি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের পরামর্শ চাইবেন। 'আমরা আমাদের সার্ভিস বাংলাদেশ সরকারের হাতে সমর্পণ করছি। কয়েকদিন আগে থেকেই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কথা বিবেচনা করছিলাম।' আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হতেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
হোসেন আলি বললেন, আমরা কেউই ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইনি। সে প্রশ্নই ওঠে না। কলকাতায় আমরাই বাংলাদেশের প্রতিনিধি। এখন ভারত সরকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। হোসেন আলি বললেন, আমি বাংলাদেশে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব—পরামর্শ চাইব।
আমি প্রায় বাইশ বছর ধরে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সার্ভিসে আছি। আমি তাদের জন্য ও সাধ্যমত পূর্ণ আনুগত্য সহকারে পাকিস্তানের সেবা করেছি।
হোসেন আলি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। তাঁর পরিবার পরিবারে—লিক্ষা চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমজাদুল হক

কলকাতার আগে তিনি সৌদি আরব, জনরুন, হল্যান্ড, রুশ ও অস্ট্রেলিয়ার নানা পদে কাজ করেছেন।
তারপর এল সেই মঙ্গলবার। ২ নবেম্বর। ১৯৭১। দিল্লির পাক হাইকমিশন ভবনের সামনে সকালে নাটকীয় কাণ্ড ঘটে গেল। অবশিষ্ট মোট এগারোজন বাঙালী কর্মীর মধ্যে দশজন প্রায় সপরিবারে বাইরে পালিয়ে এলেন। নাটকের একটি করুণ দিকও ছিল। তারতে পাক হেরেন্দ্যাচ্ছের পাণ্ডা আবদুল গণির ব্যক্তিগত সহকারী হুসেন আলি আসতে পারেননি। তাঁকে প্রচণ্ড মারধোর করে প্রকৃতপক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী আর তিন মেয়ে। তাঁর দুই ছেলে অবশ্য পালিয়ে আসতে পেরেছে।
খবর পেয়েই বাংলাদেশ মিশনের প্রধান দুর্মাহুন রশিদ চৌধুরী তাঁর দুজন সহকর্মী কে এম সাহাবুদ্দিন, আমজাদুল হককে সঙ্গে নিয়ে পাক হাইকমিশনের গেটে ছুটে যান। পাকিস্তানীরা তখন ভেতর থেকে দমাদম ইট পাটকেল ছুড়ছিল।
যাঁরা বাইরে বেরিয়ে এলেন—বেরিয়েই প্রথম কথা বললেন। জয় বাংলা। পাকিস্তানীরা বাঙালীদের দেখে ঘোড়ে এসে মারধোর করতে শুরু করে। বাঙালীরা তার ভেতরেই পরিবারবর্গকে নীচু পাঁচিলের ওপার থেকে ছুড়ে দিতে থাকেন—নিজেরাও পাঁচিল টপকাতে থাকেন।
আহত, অজ্ঞান হুসেন আলিকে চিকিৎসার জন্য ইসলামাবাদ থেকে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আনতে হল। পাক হাইকমিশন ভারতীয় ডাক্তার আনতে সাহস পাচ্ছিল না। পাছে—সব গোপন খবর ফাঁস হয়ে যায়।

নেতৃবৃন্দকে মুজিবের প্রাণরক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। কিন্তু কাজ হল। ঠ ঘানট্ বললেন, মুজিবকে ফাঁসি দিলে পাকিস্তানের বাইরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। ইয়াহিয়া দুনিয়ার মতামতকে জানাতে বাধ্য হলেন, মুজিব জীবিত। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক আদালতে মামলা শুরু হল।
প্রসঙ্গটির শেষাশেষি বাংলাদেশের কথা বলতে চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশে দেশে পাড়ি দিলেন।
ততদিনে চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। প্রতিবেশী নেপাল ভারতের বক্তব্যকেই সমর্থন করল। ৭ অক্টোবর মস্কো বলল—'পূর্ববঙ্গ।' নবেম্বরের গোড়ায় প্রাগ পরিষ্কার গলায় বলল, ভারতীয় যুক্তি আন্দোলন। মস্কোর এই স্বিধাযুক্তির পিছনে ভারতের ভূমিকা অনেকখানি। ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরপেক্ষ দেশগুলিকে জানালো, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আপনারা একটা ঐকমত্যে পৌঁছে আপনাদের বক্তব্য জানান। যতটা আশা করা গিয়েছিল, তা হল না। মস্কো রাজনৈতিক সমাধানের প্রসঙ্গ তুলতেই দিল না।
তখন নিরপেক্ষ কূটনীতির কোনরকমে একটা আপস প্রস্তাব খাড়া করলেন। ততদিনে ঠ ঘানটও রাজনৈতিক সমাধানের দিকেই ঝুঁকেছেন। প্রধানমন্ত্রী ভারিত সফরে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে মস্কো গেলেন। তিনি ক্রেমলিনে নেতৃবৃন্দকে বোঝালেন, শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করা কতখানি জরুরী।
বাংলাদেশ সমস্যাকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা বিরোধীয় বিষয় হিসাবে তুলে ধরার ষড়যন্ত্র অনেকদিনই চলছিল। ভারত এই বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনরকম দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় প্রস্তাব অক্টোবরের গোড়াতেই জানিয়ে দিল। সেই সপ্তাহেই ভারতও সরাসরি দাবি জানালো: মুজিবকে মুক্তি দাও। বিশ্ব শান্তি পরিষদ বললেন, বাংলাদেশের সংগ্রাম—জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম।
২৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তিন সপ্তাহের জন্য পশ্চিমের রাজধানী দেশে সফরে বেরোলেন। মূল কথা। আমেরিকার ধৈর্যের সীমা আছে। বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি—সর্বত্র শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বহুঘোষিত নীতি বারবার ঘোষণা করলেন।

লন্ডনে একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বললেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হলে যদি দুঃখ যেতে তাহলে আমাদের কোন বাইরের একপ্রা ফেলার দরকার হবে না। আমরা নিজেরাই লড়ব অক্সফোর্ডে তিনি ডক্টরেট উপাধি নিচ্ছিলেন। বাইরে বোঝে এসে দেখেন, ছাত্ররা হাতে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। তাদের হাতের প্লাকার্ডে লেখা: থ্যাংক্ ইউ ইন্ডিয়া ফর ফ্রীয়িং ওয়ার্ল্ডস্ জয়। কিছু ইংরেজ সাংবাদিক বলেছিলেন, আপনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলুন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, হিটলার ইউরোপের শান্তা হিটলারের সঙ্গে চার্চিলের মিটমাট কি বৈঠকে বসেছিল? ইয়াহি নিষ্ঠুরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৭ দীর্ঘদিনের দুঃখ আমার ভুলে নেননি?'

ওয়াশিংটনে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে প্রেসিডেন্ট নিক্সন বললেন, আপনিও এসেছেন—কদিনের কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদও উঠেছে। অর্থাৎ কিছু চানাচুর এবং চা—তার সঙ্গে নির্ঝার সহানুভূতিও খানিক খানিক। কফের বেলায় অন্তরঙ্গতা। বোঝাই যাচ্ছিল, রাষ্ট্রনেতাদের ভাবমূর্তিকে শ্রীমতী গান্ধী হাজির উঠেছেন। তিনি সার আমেরিকার কাছে তাঁর বক্তব্য বলতে চাইছিলেন। সে সুযোগ এল। ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে শ্রীমতী গান্ধী সারা প্রশাসনকে টপকে একেবারে সরাসরি বিপুল আমেরিকার মুখোমুখি দাঁড়ালেন—ভারতের বক্তব্য খোলাখুলি বললেন। তখন তিনি আমেরিকার জনমতের সহানুভূতি, সমর্থন যেমনো চিঠি পেতে শুরু করেছেন—স্কুলের বাচ্চারাও চাঁদা তুলে তাঁকে পাঠাতে আরম্ভ করেছে। বোঝাই যাচ্ছিল, আমেরিকার সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসন কত যোজন যোজন দূরে।

প্যারিসে তিনি বললেন, ফ্রান্স আমাদের কাছে শুধু একটি দেশ নয়—আরও কিছু—একটি আদর্শ। ফরাসী প্রেসিডেন্ট বললেন, রাজনৈতিক সমাধান বই অন্য কোন পথ নেই। প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার সাতদিনের মাথায় গরীবপুরের ট্যাংক লড়াই। তারপর একেবারে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিন অবধি মুহূর্তের সব ঘটি গিয়েছে। প্রায় মুহূর্তায় ইন্দ্রাপুরুষের মত। এই সাফল্যের পিছনে নিষ্ঠুরে ও প্রকাশ্যে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতার দান অনেকখানি।

যুদ্ধের সময়ে সুসম্পর্কেরই চাকা গোঁড়াতে হবে। কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা। অন্তর্দেশ ও সমুদ্রের মধ্যে যাতায়াত ও আমদানি রপ্তানির সবচেয়ে সুবিধে চট্টগ্রাম বন্দরের দখলে থাকা। তাই ওটার ওপরে পাক সেনা কম হবে না। পাকা রাস্তা বেশী নেই। তাছাড়া, তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ নদী বিল ও সমুদ্রের দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করেছে। তাই আক্রমণে পাকা সৈন্য কোন এক এলাকায় জড়ো হয়ে থাকা দিতে পারছে না—বাংলাদেশের গেরিলা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে।

৭

ইয়াহিয়ার শেষ লড়াই

মাত্র ছ ঘণ্টার জন্য সেদিন প্রধানমন্ত্রী কলকাতা এসেছিলেন। একমাত্র কর্মসূচী—বিশ্বের পার্লামেন্ট প্রতিনিধিদের জনসভায় ভাষণ দান। সেদিন ৩ ডিসেম্বর।

আসলে কিন্তু একদিন পরে, অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা আসার কথা ছিল। জনসভার উদ্যোক্তারাও সেইমত লোকজনকে খবর দিয়েছিলেন। সরকারী ঘোষণাতেও সেই কথাই বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪ টায় বিশ্বের পার্লামেন্ট প্রতিনিধিদের প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন, হঠাৎ সেই কর্মসূচী পাল্টে গেল। ১ ডিসেম্বর দিল্লি থেকে খবর এল, প্রধানমন্ত্রী কলকাতা আসবেন ঠিকই কিন্তু ৪ নয়, ৩ তারিখ। এবং, সেইদিনই ফিরে যাবেন।

পাক-ভারত সীমান্ত উত্তেজনা তখন চরমে। পূর্বে গণ্ডগোল। পশ্চিমে গণ্ডগোল। আকাশেও লড়াই। আকাউড়া, বিলি, বরবার প্রায় রোজই সংঘর্ষ হচ্ছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত লড়াই-ও শুরু হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীর সীমান্তেও গুলি গোলা চলা শুরু হয়েছে। জম্মুর ওপর বারকয়েক পাক বিমান হানা দিয়ে গিয়েছে। একেবারে চরম মুহূর্ত। এই সময় প্রধানমন্ত্রী কলকাতা আসছেন।

সকলের মুখেই তখন এক প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী কেন কলকাতা আসছেন? কী এমন জরুরী এই [illegible] কলকাতা [illegible] কোনও [illegible] দিল্লি থেকে প্রচারিত হল যে প্রধানমন্ত্রী কলকাতার কর্মসূচী একদিন পিছিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কলকাতা আসা নিয়ে [illegible] মত ছিল না। তিনি চাইছেন সেখানে যেতে দেশ সবাই আমার সঙ্গে করে নিক। জনসভা করলে প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফর পিছিয়ে দেওয়ার কারণ কী? বিদেশী সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুললেন, তাহলে কি নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই ইয়াহিয়া খানই লড়াই শুরু করবেন? সেই মতো কলকাতাকে সতর্কও দেবেন এবং, দুটো ঘোষণাই হবে কলকাতায়? বলা বাহুল্য, বিদেশী সাংবাদিকদের অনেকেরই তখন ধৈর্যচ্যুতি, ভারতই প্রথম যুদ্ধটা শুরু করবে।

প্রধানমন্ত্রী যথা সময়ে কলকাতা এলেন। যথা সময়ে ব্রিগেড পারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় ভাষণ দিয়ে গেলেন। এবং, যখন তাঁর ভাষণ শেষ হল তখন সবাই দেখলেন, নতুন কোনও চমকপ্রদ কথা বলেননি, সেদিন কোনও গুরুত্বপূর্ণ সেই যুদ্ধ শুরু করা বা ঘোষণার

সংবাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথাও।
অনেকে হতবাক হলেন। অনেকে চুপচাপ বাড়ি ফিরে গেলেন। বিশ্বের সাংবাদিকরা কলকাতার এক ঘর থেকে খবর পাঠালেন: ইট ওয়াজ এ ডার্ক মিটিং। নো স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্ট। নো স্ট্রেট টু পাকিস্তান। নো রেকগনিশান টু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট।
ওদিকে কিন্তু তখন পুরোদমে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গিয়েছে। বিদেশী সাংবাদিকরা যেমন অনুমান করেছিলেন তেমনি কোনও অনুমানের ভিত্তিতে বা নিজস্ব কোনও হিসাব অনুসারে ইয়াহিয়া খাঁ তৎক্ষণে তার সেনা ও বিমান বাহিনীকে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিয়ে দিয়েছে। পাক সেনা বাহিনী তৎক্ষণে আঘাত হেনেছে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের নানা অঞ্চলে। পাক বিমান বাহিনীও আক্রমণ সুরু করেছে বিভিন্ন ভারতীয় শহরের উপর। ইয়াহিয়া খাঁর পরিকল্পনা, ইসরাইল যেমন মিশরকে ঘায়েল করেছিল পাকিস্তান তেমনি ঘায়েল করবে ভারতকে। কার্টাত আক্রমণে ভারতকে পাংচুয়া করবে পাকিস্তান! মাটিতে মিশিয়ে দেবে ভারতীয় বিমানবাহিনীকে! যুদ্ধ সুরু করার বাহেই যুদ্ধের আশা মিটিয়ে দেবে ভারতের!
প্রধানমন্ত্রী তখনও কলকাতায়। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভা শেষ করে রাজভবনে। রাজভবনেই প্রথম খবরটা পেলেন তিনি। পাকিস্তান লড়াই সুরু করে দিয়েছে। আকস্মিক বিমান আক্রমণ চালিয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় শহরের উপর। ৫-৪০ মিনিটে আক্রমণ করেছে অমৃতসর। ৫-৪৭-এ শ্রীনগর। ৬-৮ মিনিটে কাশ্মীর উপত্যকায় অবন্তীপুরে। সাড়ে সাতটার সময় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান উড়ল দমদম থেকে। দিল্লি ফিরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বিমান বাহিনীর জরুরী বিমানও উড়ে চলল সঙ্গে সঙ্গে। আকস্মিক কোনও পাক হামলা হলে মোকাবিলা করতে।
দিল্লি ফিরেই প্রধানমন্ত্রী একে একে সব ব্যবস্থা নিলেন। কথা বললেন প্রতিরক্ষা-বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে। ডাকলেন মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক। সারা ভারতে জারি করলেন আপৎকালীন অবস্থা। পরদিন সকালে ডাকা হল সংসদের জরুরী অধিবেশন। এবং, ওরা রাতে জাতির উদ্দেশে দিলেন বেতার ভাষণ।
সে ভাষণও শুনতে ও সবেতে। বললেন: পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ যুদ্ধ বাংলাদেশের। এ যুদ্ধ আমাদের। দীর্ঘকালীন কৃচ্ছ্র ও আত্মত্যাগের জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এরও আগে বসেছিলেন মুক্তি ফৌজ প্রধান -সেনাবাহিনীর মানেকশ, বিমান বাহিনীর লাল এবং নৌবাহিনীর নন্দ। প্রথম পাকিস্তানী বিমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রধানই তাঁদের সদরদপ্তরে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন: ওয়ার ইজ অন। হিট ব্যাক। হিট ব্যাক উইথ অল দেওর মাইট।
৩ ডিসেম্বর। ১৯৭২। মধ্যরাত্রি থেকেই পুরো দমে সুরু হয়ে গেল ভারত-পাক যুদ্ধ। এবং, সেই সঙ্গে সুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। চতুর্দিক থেকে বাংলাদেশের দখলদার পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ সুরু করল ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী। আর, বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ।
সব যুদ্ধই কোনও একটা মুহূর্তে সুরু হয়। কিন্তু তা বলে কোনও যুদ্ধই ঠিক আকস্মিক সুরু হয় না। প্রত্যেকটা যুদ্ধের পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। থাকে বিস্তারিত পরিকল্পনা। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলেই সুরু হয় সেই প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা।
যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা। যেমন এ যুদ্ধেরও ছিল। এবারের ভারত-পাক যুদ্ধের। এবং, তারই মূল অঙ্গ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়েরও।
এপ্রিল-মে থেকেই ভারতীয় এবং পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা রচনার কাজ সুরু করে দিয়েছিল। আর, সেই সঙ্গেই সুরু হয়েছিল প্রস্তুতি।
সাধারণত লক্ষ্যটা স্থির করে যেন রাষ্ট্র নায়করা। সমর নায়করা সেই অনুসারে তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করেন এবং প্রস্তুতি গড়েন। এপ্রিল মাসের শেষ দিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামনে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের কয়েকটা দিক তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন: (এক) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম চালাবে মূলত বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী। ভারতীয় সেনা বাহিনী গৌনি এবং অল্পসল্প দিয়ে মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করবে।
(দুই) মুক্তি বাহিনীকে ভারত সরকার সাহায্য দিচ্ছে বলে পাক বাহিনী যদি ভারতের উপর হামলা করে তাহলে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে সেই আক্রমণের জবাব দিতে হবে।
(তিন) বাংলাদেশ সমস্যার যদি কোনও রাজনৈতিক সমাধান না হয় তাহলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে হতে পারে। (চার) যদি চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নামতে হয়ই তাহলে

তার লক্ষ্য হবে রাজধানী ঢাকা সহ গোটা বাংলাদেশকে দখলদার পাক বাহিনীর কবল মুক্ত করা। (পাঁচ) মুক্তি সংগ্রামে যদি প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী নামে তাহলে রাজধানী সহ গোটা বাংলাদেশকে খুব দ্রুতগতিতে মুক্ত করতে হবে। (ছয়) বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী অংশ নেওয়া মানেই হবে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। সুতরাং, লড়াই শুধু পূর্বে হবে না, হবে পশ্চিমেও। এবং (সাত) পাক-ভারত লড়াই হলে উত্তর সীমান্তে চীনের কথাও মনে রাখতে হবে।

এই নির্দেশের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী শুরুতেই তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করল এবং প্রস্তুতি শুরু তুলল। (এক) মুক্তি বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া এবং তাঁদের অস্ত্র সরবরাহ করা। (দুই) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইয়ের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা এবং তার প্রস্তুতি শুরু তোলা।

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রথমেই কতকগুলি অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত, বাংলাদেশের প্রকৃতি। বাংলাদেশে অসংখ্য নদী নালা। কতকগুলি নদী বিশাল। আর, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র জলাভূমি এবং এইসব জলাভূমিতে শীতকালেও কিছু কিছু জল জমে থাকে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নদী নালাগুলি অধিকাংশই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। তাই পশ্চিম থেকে পূবে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ, ভারত থেকে বাংলাদেশে কোনও বড় সেনাবাহিনীকে পাঠাতে হলে, নানা কারণে পশ্চিম দিক থেকে পাঠানোই সুবিধা। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে রাস্তাঘাট অত্যন্ত কম সামান্য কয়েকটি মাত্র পাকা রাস্তা আছে। সেগুলিও অসংখ্য নদী নালার ওপর দিয়ে গিয়েছে। চতুর্থত, প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ-বোট পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে পাক দখলদার বাহিনীতে মোট সৈন্য এবং আধা সৈন্য প্রায় চার ডিভিশন। সামরিক বিশেষজ্ঞদের হিসাব মত ঘাঁটি থেকে কোনও সেনা বাহিনীকে উচ্ছেদ করতে হলে আক্রমণকারীর অন্তত তিনগুণ শক্তি চাই। অর্থাৎ, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য অন্তত বারো ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য প্রয়োজন। অথচ তা পাওয়া যাবে না। কারণ, পশ্চিম ফ্রন্টেও বহু সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ রাখা প্রয়োজন। আর, উত্তরের জন্যও কিছু সৈন্য এবং বিমান মজুত রাখতে হবে। পঞ্চমত, এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও খুব দ্রুত ঢাকা সহ বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশে এমন সতর্কভাবে লড়াই চালাতে হবে যাতে সাধারণ নাগরিকের কোনও ক্ষতি না হয়, দেশের কোনও সম্পদ ধ্বংস না হয় এবং লড়াইটা চলে শুধু পাক বাহিনীর সঙ্গে। অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করতে হবে, কিন্তু আর পাঁচটা লড়াইয়ের মত সর্বাত্মক লড়াই করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য একটা কিন্টারিট পরিকল্পনা রচনা করল। সেই পরিকল্পনার পাঁচটা লক্ষ্য।

প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, কিন্তুরা। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী স্থির করল যদি যুদ্ধে নামতেই হয় তাহলে দু সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা পৌঁছতে হবে। কেন্দ্র বিন্দু ঢাকা। একমাত্র সেই দিকেই এগোতে হবে। অন্যান্য শহর বা ঘাঁটি দখলের জন্য সময় বা শক্তি নষ্ট করা হবে না। সেগুলিকে এড়িয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য, শত্রু পক্ষকে ধোঁকা দেওয়া। তাকে বোঝাতে হবে যে তার চেয়ে অন্তত চারগুণ শক্তি নিয়ে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করছে। আর তাকে দেখতে হবে যে ভারতীয় বাহিনী সবদিক থেকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছে। যাতে শত্রু পক্ষ তার সৈন্য বাহিনী কোনও একটা এলাকায় জড় না করতে পারে এবং বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় লক্ষ্য, সেই ছড়িয়ে পড়া পাক বাহিনীকে আবার একত্রিত হতে না দেওয়া। যাতে পাক বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াইয়ে না নামতে পারে এবং যাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে তারা ঢাকা রক্ষার জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে কোনও শক্ত ঘাঁটি না বানাতে পারে।

চতুর্থ লক্ষ্য, ভারতীয় বাহিনী যাতে পাক বাহিনীর সঙ্গে কোথাও কোনও বড় দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পড়ে এবং যেন ভারতীয় বাহিনীর ক্ষতি যথা সম্ভব কম হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর পরিচালকরা এটাও জানতেন যে কোথাও কোনও বড় দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ হলে তাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে এবং ভারতীয় সম্পদও ধ্বংসে হতে থাকা। এইজন্য ভারতীয় বাহিনী প্রথম থেকেই ঠিক করল বাংলাদেশে ঢুকতে হলে বড় সড়কগুলি এড়িয়ে যাবে। এবং এমনভাবে কাঁচা পথ ধরে-যেখানে পাক

তিনটি পাক সাবের জেট ধ্বংস হয়েছে। এটি হলো ভারতীয় ঘাঁটি। এখানে ধ্বংস। সাবের জেট বোমারু। আঘাত করছে। আঘাত করছে। ভারতের ভারতের তিনটি জেট ধ্বংসকারে। এটি থেকে নিচে আঘাতের বোমা ঘাঁটি।

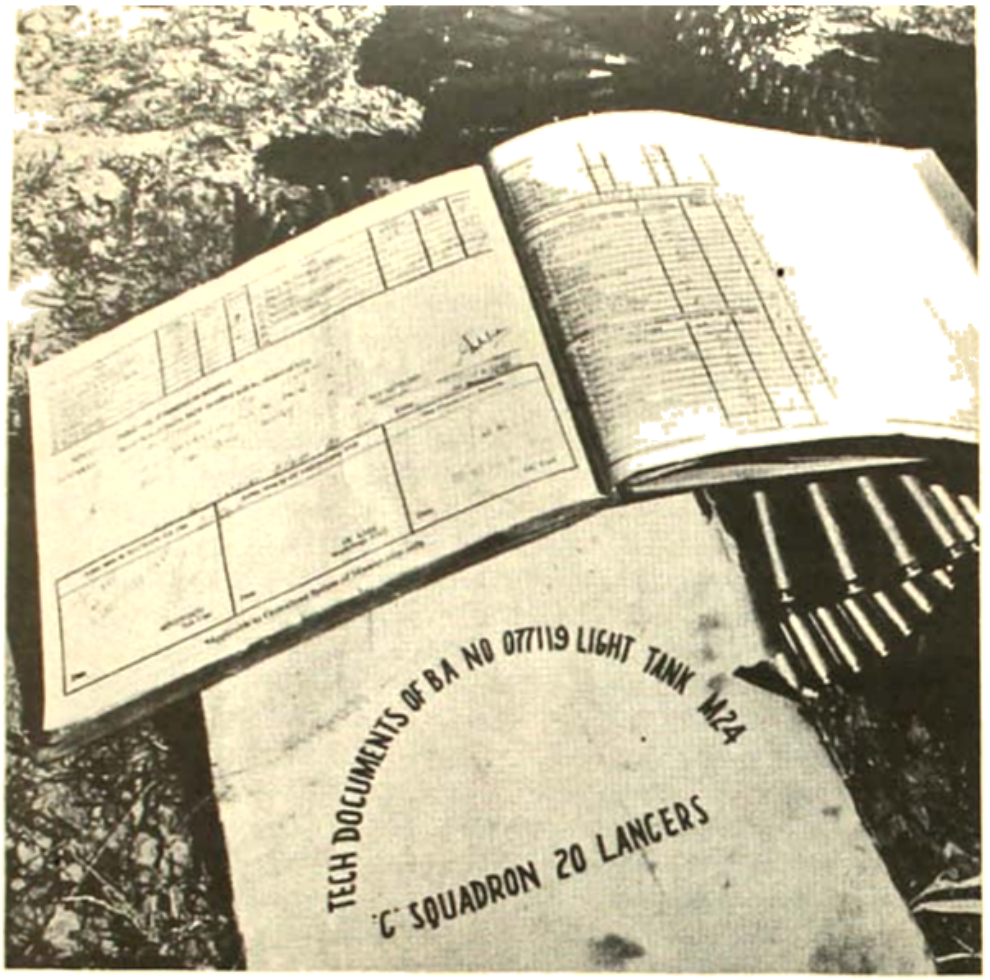

বাহিনী তাকে অলা করবে না, যেখানে পাক-বাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ বা মাইন থাকবে না, যেখানে শত্রুপক্ষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আনতে পারবে না এবং যেখানে জনবসতি খুবই কম থাকবে।

পঞ্চম লক্ষ্য. গোড়া থেকেই এমনভাবে যান্ত্রিকপটা চালানো এবং পরিচালনা করা যাতে বাংলাদেশের দখলদার পাক বাহিনীর মনোবল লড়াইয়ের প্রায় শুরুতেই ভেঙে দেওয়া যায় এবং যাতে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে আগেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এই পাঁচটা লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত বাংলাদেশের প্রায় চতুর্দিকে এইভাবে তার সেনাবাহিনীকে সাজালো :

২নং কোর। সদর দফতর কৃষ্ণনগর
প্রধান : লে: জে টি. এন. রায়না। দুটো পার্বত্য ডিভিশন। ১ম ও ৪র্থ। এবছর টি-৫৫ এস ব্রুস ট্যাঙ্ক সজ্জিত একটি মাঝারী আরমরড রেজিমেন্ট, পি. টি-৭৬ সাতার ব্রুস ট্যাঙ্ক সজ্জিত প্রায় একটি হাল্কা ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট একটা মাঝারী আরটিলারি রেজিমেন্ট— ১০০ মিলিমিটার দূর পাল্লার ব্রুস কামান সহ ব্রিজ তৈরী করতে পারে এমন একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ১ম ডিভিশন তার প্রধান ঘাঁটি করল ২৪ পরগনার বরুয়ার কাছাকাছি। ৪র্থ ডিভিশনের মূল ঘাঁটি হল কৃষ্ণনগর গেদের মাঝামাঝি।

৩৩নং কোর। সদর দফতর শিলিগুড়ি।
প্রধান : লে: জে: এম এল. থাপান।
৬ এবং ২০নং পার্বত্য ডিভিশন।
এবছর ব্রুস পিটি-৭৬ এম ট্যাঙ্কে সজ্জিত একটা হাল্কা আরমরড রেজিমেন্ট, ব্রিটিশ ৫.৫ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটি মাঝারী আরটিলারি রেজিমেন্ট এবং ব্রিজ তৈরি করার একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ২০নং পার্বত্য ডিভিশন প্রধান ঘাঁটি করল বাগডোগরার কাছে। ৬নং ডিভিশন

কোচবিহার জেলায়।
এই ৩৩নং কেন্দ্রের আর একটা ঘাঁটির হল সোহাগীতে। পরিচিতি ১০১নং কমিউনিকেশন জোন। প্রধান: মে: জে জি. এস. সিন্হা। শক্তি: দুই ব্রিগেড পদাতিক সৈন্য। জামালপুরের কাছে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ে জেনারেল সিন্হা আহত হওয়ার পর এই বাহিনীর প্রধান হলেন মে: জে: জি. নাগরা।
৪নং কেন্দ্র। সদর দফতর: আগরতলা।
প্রধান লে: জে: সগত সিং। ৮, ৫৭ এবং ২৩নং পার্বত্য ডিভিশন। তাছাড়া, দু স্কোয়াড্রন পি. টি-৭৬ এম্ফিবিয়াস ট্যাঙ্ক, বৃটিশ ৩·৫ ইঞ্চি জামানের সজ্জিত একটা মাঝারী রেজিমেন্ট এবং ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ঐ তিনটি পার্বত্য ডিভিশনকে ভাগ ভাগ করে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন এলাকায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।
এটা ভারতীয় সেনা বাহিনীর হিসাব।
এর সঙ্গে ছিল কর্নেল ওসমানির অধীনস্থ প্রায় ৪০,০০০ মুক্তিসেনা। এরা মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত ছিলেন: মুক্তিফৌজ এবং মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিবাহিনী (এফ এফ)। ট্রেনিং প্রাপ্ত ও পুনর্গঠিত মুক্তি বাহিনীর সৈনিকরা নয় পর্যায়ে জুন মাস থেকেই বাংলাদেশের ভেতরে লড়াই চালাতে সুরু করেছিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন মে: জে: বি. এন. সরকার। যুদ্ধ যখন পুরোদমে সুরু হয়ে গেল এবং যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে লড়াইয়ে অংশ নিলেন তখন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠিত হল একটি কমান্ড। এই কমান্ডের প্রধান হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে জে: জগজিৎ সিং অরোরা।
এখানে দুটো জিনিষ বোধ হয় আমার ব্যাখ্যা করে রাখা ভাল।
ওপরের তালিকা থেকেই দেখা যাচ্ছে ভারত বাংলাদেশের চতুর্দিকে যে সৈন্য সাজালো তারা অধিকাংশই পার্বত্য ডিভিশনের।
পার্বত্য ডিভিশন গঠনে যে-কোনও অন্য ডিভিশনের মতই, কিন্তু যেহেতু প্রধানত পাহাড়ে লড়াই করার জন্য পার্বত্য ডিভিশন গঠিত হয় সেইজন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র হয় একটু হাল্কা ধরনের। ট্যাঙ্ক বা ভারী জামান পার্বত্য ডিভিশনে থাকে না। এই জন্যই বাংলাদেশে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে গিয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বাড়তি ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারি রেজিমেন্ট যোগ করে। এর মধ্যে বেশ কিছু হাল্কা ট্যাঙ্কও ছিল।
দ্বিতীয়ত, পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে সাধারণত বড় ব্রিজ তৈরী করার জন্য ইউনিট থাকে না। কারণ, পাহাড়ের উপরে নদী চওড়া হয় না। অথচ বাংলাদেশ চওড়া নদীতে ভরা। কতকগুলি নদী বিশাল। এইজন্য বাংলাদেশে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

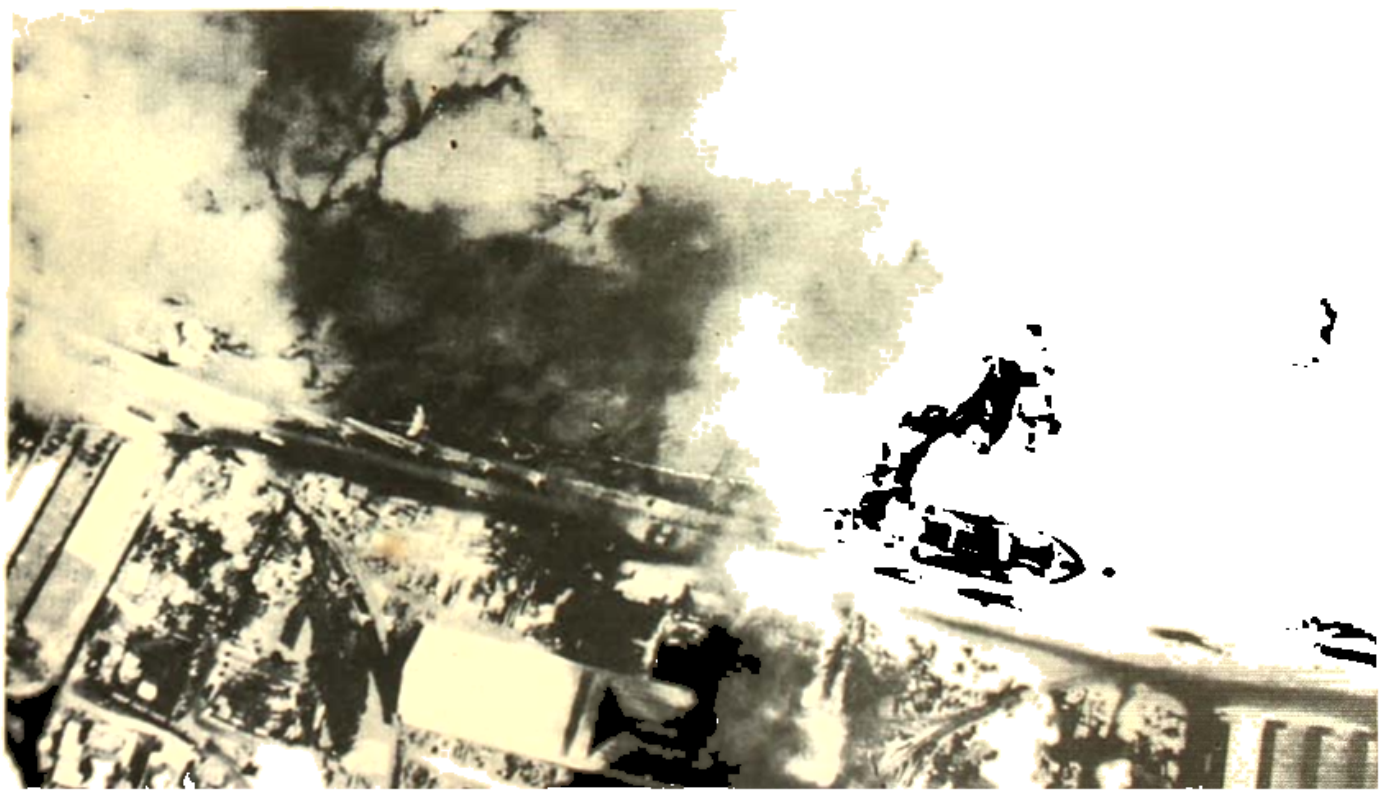

ঐরোয়া বিমানবন্দরে বোমা ফেলে আর খোলা যুদ্ধে ভূলুণ্ঠিত করে ভারতের নৌবাহিনীর বীরত্বগাথা। ছবিটি বিমান থেকে তোলা।

পাকিস্তান-বিরোধী এবং মুক্তিযোদ্ধা সমর্থকদের

প্রত্যেকটি পার্বত্য ডিভিশনের জন্যে বড় বড় ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটও দেওয়া হল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা বাংলাদেশের জন্য তিন পর্যায়ে তিন ভিন্ন সামরিক পরিকল্পনা তৈরী করে। প্রথম পর্যায়, ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। এই পর্যায়ের পাকিস্তানী সামরিক পরিকল্পনা ছিল সমস্ত শহরগুলিতে কর্মরত বাঙালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়, যাকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মনে হয় তাকেই শেষ করে দাও।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ যখন ট্রেনিং সহ পুনর্গঠিত মুক্তিবাহিনী গেরিলা কায়দায় আক্রমণ সুরু করল তখন পাক বাহিনীও বাংলাদেশে তার সামরিক পরিকল্পনা পাল্টাল। এই পর্যায়ে তারা শুধু সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করল না। গড়ে তুলল দুটো স্থানীয় বাহিনীও। এর একটা হল রাজাকর বাহিনী—সাধারণ ট্রেনিংপ্রাপ্ত অত্যাচারীর দল। অন্য একটা আলবদর বাহিনী—প্রধানত ধর্মান্ধ যুবক এবং গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকদের নিয়ে গঠিত অসামরিক বাহিনী। গেরিলা এবং পাক বিরোধীদের খতম করার জন্য পাক সামরিক বাহিনী এই দুই ধরনের বাহিনীর সাহায্য নিল। রাজাকর বাহিনীর হাতে অস্ত্রও দেওয়া হল প্রধানত রাইফেল। নানা রকমের দায়িত্ব পেল তারা। যেমন,

গেরিলাদের খুঁজে বের করা, গেরিলাদের সহকারী এবং আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার চালানো ও তাদের নাম ধাম সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করা, ফিল্ড টেলিফোন ইত্যাদি পাহারা দেওয়া। আলবদর বাহিনীকেও মোটামুটি একই রকমের দায়িত্ব দেওয়া হল। এক পাহারা দেওয়া ছাড়া। তাদের সক্রিয় করে তোলা হল প্রধানত শহর অঞ্চলে। শহরে এবং শহরের আশপাশে যারা যারা পাকিস্তান বিরোধী এবং মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থক তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পেল আলবদর। সেনাবাহিনী এই দুই বাহিনীর কাজ কর্ম নিয়মিত তদারক করত। এই দুই বাহিনীকেই সেনাবাহিনী ঢালাও সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিল।

রাজাকর বাহিনীর হাতে প্রধান অস্ত্র রাইফেল

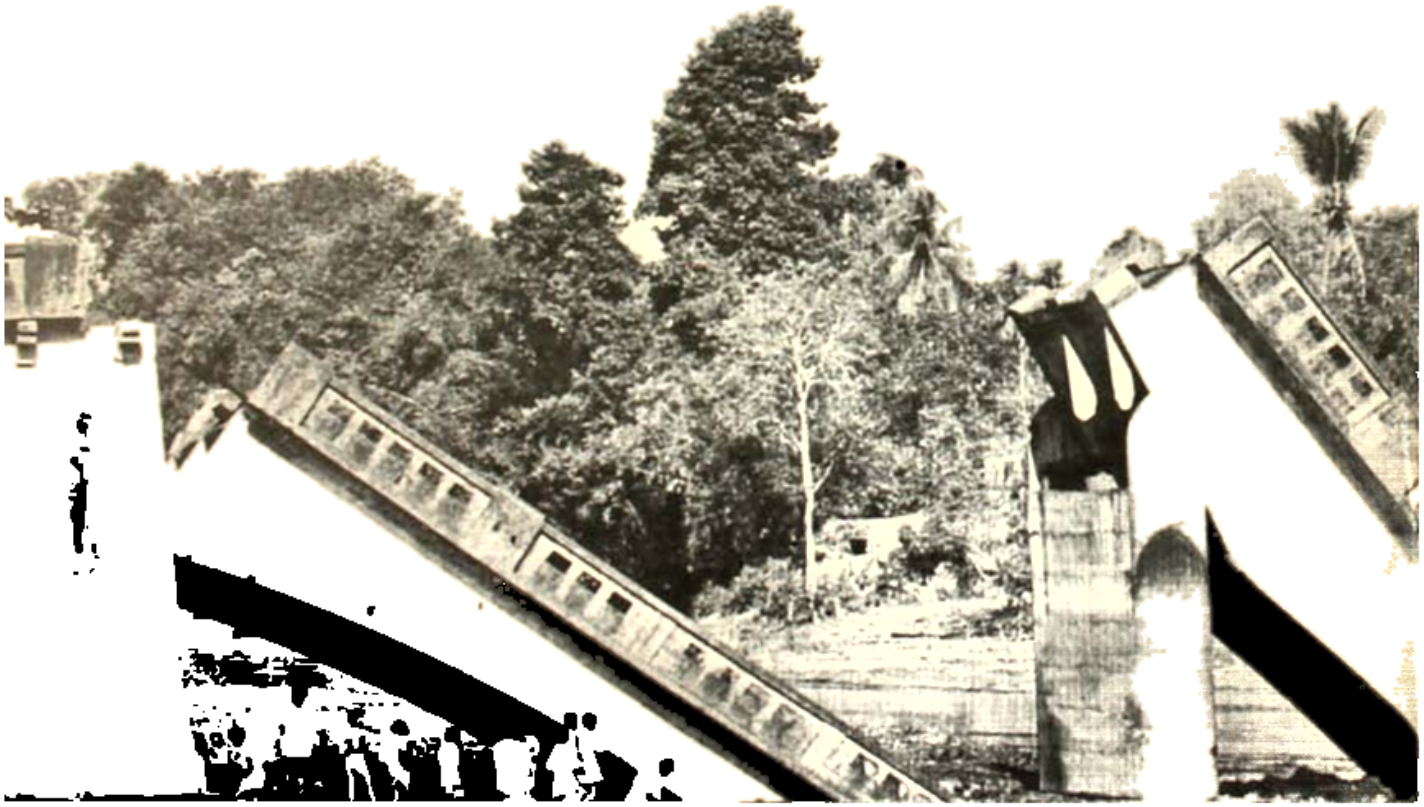

খুঁজে বের করার দায়িত্ব পেল আলবদর

মুক্তিবাহিনীর সেক্টর আক্রমণ যত বাড়তে আরম্ভ করল পাক কর্তৃপক্ষও ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সাধারণ বাঙালীর উপর সেনাবাহিনী ও তার দুই দালাল গোষ্ঠীর অত্যাচারও ততই বেড়ে চলল।

একদিকে যখন সাধারণ মানুষের উপর, বিশেষ করে সাধারণ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার বাড়ল অন্যদিকে তখনই পাক সেনাবাহিনী সীমান্তেই মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ রুদ্ধ করার জন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভাঙ্গাগোড়া চলে আসার চেষ্টা করল। বর্ষাকালে এই কাজে তাদের অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু বর্ষা একটু কমতেই তারা রাজাকরদের নিয়ে সীমান্তের যত ভাঙ্গাগোড়া সম্ভব চলে আসার চেষ্টা করল। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ এই ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। ২৭৪টা সীমান্ত চৌকির জায়গা প্রায় ২১০টায় পৌঁছে গেল। ২৫ মার্চের পর পাক ফৌজ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে প্রায় সব সীমান্ত চৌকি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এই রকম সময় পাক রক্ষীনায়করা ঢাকার পাক কর্তৃপক্ষের জন্য আবার তাদের নতুন নির্দেশাবলী পাঠাল। এই নির্দেশাবলীর প্রধান ভাষ্যটা ছিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পাক কর্তৃপক্ষ বলল আমরা মনে করি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পূর্ব পাকিস্তানের কতকগুলি সীমান্ত অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করবে এবং ভারত সরকার সেই দখলকৃত এলাকায় স্বাধীন বাংলা সরকার নামক বস্তুটিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারপর সেই তথাকথিত স্বাধীন বাংলা সরকার দেখিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতির চাপ বাড়াবার চেষ্টা করবে। আমাদের মনে হয় না ভারত সরকার গোটা পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে নামবে। সে সাহস তারা পাবে না। তারা চাইবে সীমান্তের কতকগুলি কয়েকটা বড় শহরকে নিয়ে একটা তথাকথিত মুক্ত এলাকা গঠন করতে।

এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ইসলামাবাদ ঢাকাকে নির্দেশ দিল মুক্তাঞ্চল এমন ভাবে আমাদের পুনর্দখল করতে হবে যাতে

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে পাঠানো

ওরা পূর্বে পাকিস্তানের কোনও বড় এলাকা দখল করতে পারে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সীমান্তেই সুদৃঢ় করতে হবে। এবং দেখতে হবে কোন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কখনও বা কোনমে পূর্ব পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলে ঢুকে তা না দখল করতে পারে। সীমান্ত অঞ্চলে এক আধ মাইল ওরা ঢুকে পড়লে ক্ষতি হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বেশি দূর কিছুতেই এগোতে দেওয়া হবে না।

এই নির্দেশ পেয়েই বাংলাদেশে দখলদার পাক বাহিনীর প্রধান লেঃ জে এ. এ. কে. নিয়াজি বোঝার চেষ্টা করল ভারতীয় সেনাবাহিনী কোন্ দিকটায় ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। নানাভাবে খবর নিল। পার্টনিদের নিয়ে বার বার পরামর্শ করল। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী কোন্ দিক দিয়ে এগিয়ে কোন্ এলাকা মুক্ত করতে চাইতে পারে। ততদিনে সীমান্তে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি পুরোদমে সুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়াজি সব দিকের খবর নিল।

এবং দেখল চতুর্দিকে প্রস্তুতি। যে কোনও দিক দিয়ে আক্রমণ হতে পারে।

এই অবস্থায় নিয়াজি একটা "মাস্টার প্ল্যান" তৈরী করল। তার পরিকল্পনাটা হল এই রকম:

সীমান্তের সবগুলি পাকা রাস্তার উপর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করা হবে।

ভারতীয় বাহিনী যেখানে যেখানে জড় হয়েছে তার ঠিক উল্টো দিকে সুদৃঢ় বাঙ্কার তৈরী করে তাতে ভারী কামান সহ পাক সেনাদের বসিয়ে দেওয়া হবে। যে রাস্তা দিয়েই ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুক সেই রাস্তাতেই তাকে বাধা দেওয়া হবে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করবে পাক সেনাবাহিনী। আর, অন্যান্য আধা সৈনিকরা লড়বে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে।

পরিকল্পনা পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়াজি তার গোটা সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে দশ পনেরো মাইল, কোথাও কোথাও তিন চারশ মাইল পর্যন্ত বড় বড় সড়কের উপর অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করল এবং প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটির মুখোমুখি ভারী কামান ও ট্যাঙ্ক সহ পাক সেনাবাহিনীকে খাড়া করিয়ে দিল।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা তাই দেখে ভীষণ খুশী হলেন। তারা বুঝলেন, পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে। নিয়াজি তার সেনাবাহিনীকে দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে গোটা সীমান্তটা রক্ষা করতে চাইছে এবং বুঝতেই পারছে না যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগদিলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক কোন্ দিক দিয়ে এগোবে।

বাংলাদেশে নিয়াজির হাতে তখন পাক সেনাবাহিনীর প্রায় ৪২টা নিয়মিত ব্যাটেলিয়ান। ৩৫ ব্যাটেলিয়ন পাক সেনা এবং ৭ ব্যাটেলিয়ান পশ্চিম পাকিস্তানী রেঞ্জার। আর আধা সামরিকদের মধ্যে ইপাট পাকিস্তান

সেনা সমাবেশ ও
যুদ্ধ সাজে সৈন্যবাহিনীর
অগ্রযাত্রা দেখিয়ে

ভারতের দুই সেনা অফিসার
আমাদের বাংলাদেশ কাউন্টার বাস্টে
ছিন্ন সাজোয়া গাড়ি ফেরে বসে
ছবিটেছে। সামনে খুলনা আর
এক মাইল।

সিলেট সেক্টরেও যোগাযোগ
এবং ও উইংগ হেডকোয়ার্টার।
নিয়মিত সৈন্য প্রায় ৯০,০০০। এবং
সামরিক বাহিনীতে প্রায় ২৫,২০০
এছাড়াও পাক কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল
আরও প্রায় ২৫,০০০ ইপিসি
সিভিলিয়ান ফোর্স ছিল।
মোট সৈন্য ছিল মাত্র ৯২ ব্যাটেলিয়ন কিন্তু
নামে ডিভিশন ছিল চারটে। ১৪, ৩২, ১ ও ১৬
এছাড়াও ৩৬নং ডিভিশন নামে আর একটা
ডিভিশন ছিল যেসব সৈন্যদের সমন্বয়ে
অধীনে। তাদের আত্মবিশ্বাস এই
অনুভবে ছিল।
সীমান্তের চতুর্দিকে এই বাহিনীর সন্নিবেশ
দিয়ে নিয়াজি ভেবে ছিলেন, পরিস্থিতি হলেন
তার হাতে এখন গুলি ... তাও প্রচুর।
নিয়াজি যত সৈন্য চেয়েছিল পাক কর্তৃপক্ষ
তখনও ... তাদের দেননি ... এর চাইতে বড়

সংখ্যা।
বড় কথার কিছু নয়
এখন সীমান্তের
বিস্তারে নিয়াজির বুকে
হতাশার চাপের ভোরকে
সীমান্ত

প্রচুর গোলাগুলি তখন পাক কর্তৃপক্ষের হাতে

ট্যাঙ্ক, বিমান ও কামানও সীমান্ত সন্নিহিত
থেকে আসেনি। কিন্তু সন্নিহিতের ওপরে
নিয়াজিকে ভোলা যাবে কিছু তেমনও কাজও
করেনি। যা চেয়েছিল ... তাকে
দিয়েছিল। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ এবং চীন
থেকে পাওয়া প্রচুর গোলাগুলি এখন পাক
কর্তৃপক্ষের হাতে।
নিয়াজির নবম ডিভিশন এখন ঢাকাতে
ছাউনিতে। নবম ডিভিশনের সৈন্যরা
থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে
ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার প্রথমে ছিল
সরিয়ে সেটাকে নিয়ে আসা হয় যশোরে।
গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের
সমস্ত সীমান্তের ভেতর পাক ডিভিশনের
সৈন্যরা ব্যাপার ভরে বসল। ১৪ এবং
ডিভিশনের ভাগে পড়ল পূর্ব সীমান্ত
দখিনে। উত্তর সীমান্তের ঠাকুরগাঁও
দক্ষিণে কক্সবাজার পর্যন্ত ১৬ এবং
ডিভিশনের সৈন্যরা ছড়িয়ে।
বাংলাদেশে পাক বাহিনীর হাতে ছিল
৮৬টা মার্কিন স্যাবি ট্যাঙ্ক। আর ছিল ... প্রায়ই
সাঙ্ঘাতিক যা ভারী কামান। নিয়াজি তাদের সব
সীমান্তের কাছাকাছি নিয়ে এল।
মুক্তিবাহিনী প্রধান প্রধান তাদের ঘাঁটিগুলির
মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য এর ... ভাগ
নিয়ে গড় করল পাঁচটা সেক্টর হেডকোয়ার্টার
হিলি, রামগড়, সিলেট এবং আখাউড়ায়।
দুপক্ষই বুঝেছিল যা হওয়ার শীতকালেই
হবে। এই দুপক্ষই প্রস্তুতিপর্বে

হয়ে গিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর লোকেরা
সেই সব কামানের সঙ্গিনও নিয়ে নিয়েছে।
নিশ্চিত এই বড় ... বড় ... ছিল প্রস্তুতির
... ওপরে ... মুক্তিবাহিনীর
এর

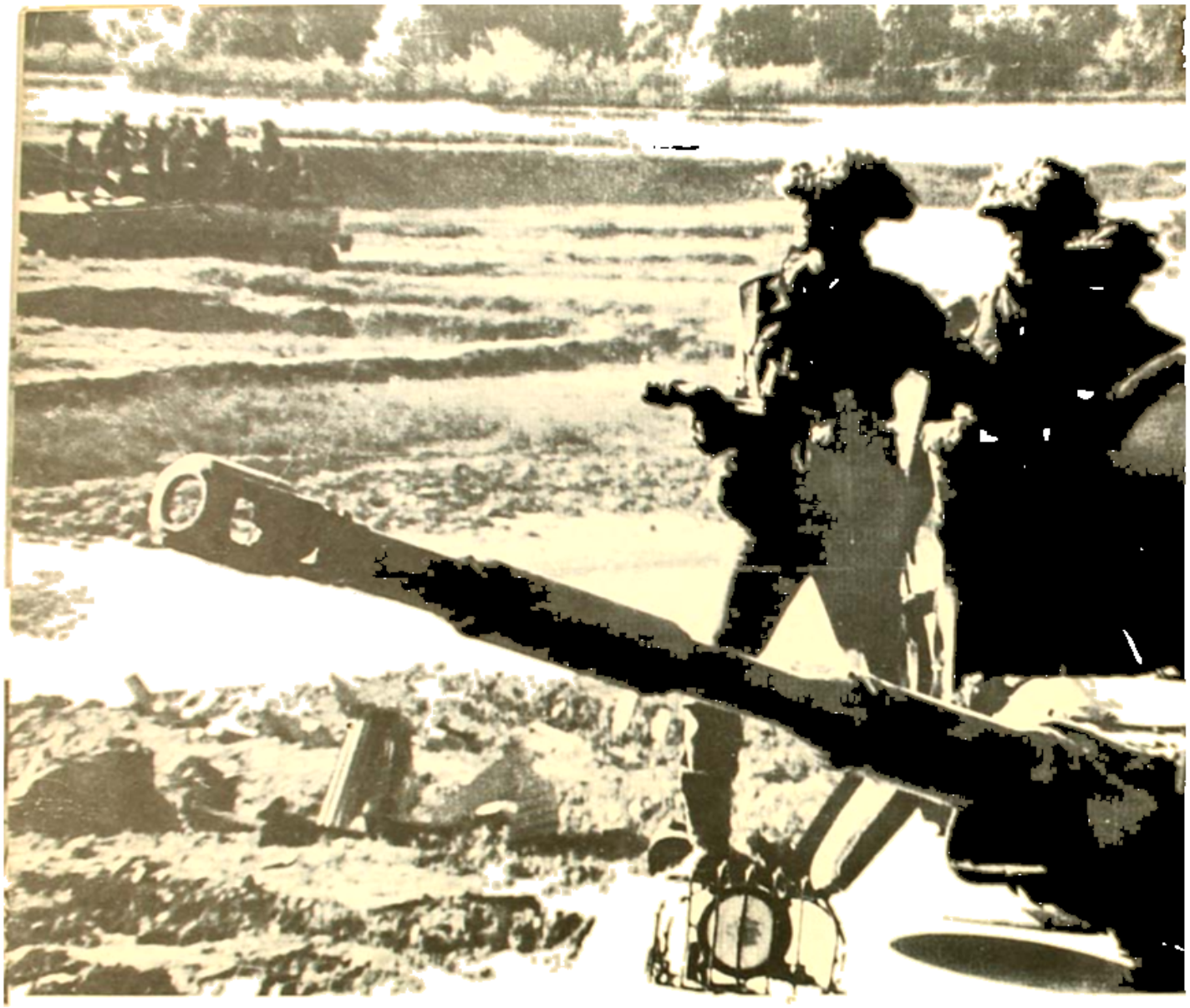

যুদ্ধের পরে প্রকাশ [illegible] বিশ্বেছে, এই
ব্যাপারে নিশ্চিত ইসলামাবাদের ওয়াশিংটন
সমর্থন নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল।
তাদের ধারণা ছিল যুদ্ধবিরতিকে চালু করলেই
ওয়াশিংটন পাকিস্তানের সাহায্যে ছুটে আসবে।
কিন্তু তা কিছুই করা হয়নি।
করতে হলে সাহায্য অব্যাহত রাখতে হয়।
পাকিস্তানের সামরিক বিশ্লেষকরা এখনও
মনে করছে, ভারত কিছুতেই পূর্ণ যুদ্ধের
ঝুঁকি নিয়ে সাহস পাবে না। এই
ধারণা নিয়েছিল তারা প্রয়োজনে সাহায্যের
ওপরে নির্ভর করে মুক্তিবাহিনীকে ঘায়েল করে এনে।
কার্যতঃ অনুমান থেকে নিয়েছিল যুদ্ধের
পরিকল্পনা সব কটা ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে
প্রয়োজনে সাহায্য কম করা।
নির্ঘাত আর একটা ফাঁদে পা দিল।
নভেম্বরেই শুরু হয়ে গেল পাক সেনাবাহিনীর
ভারতীয় সীমা অতিক্রম করে এই ঘটনা
ঘটতে আরম্ভ করল চাঁদপুর শরণার্থী, নলীয়ার,
শিলচরপুরে, কোচবিহারে, আগরতলার বিভিন্ন
স্থানে এবং হিলিতে [illegible] অঞ্চলে
ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষী
বাহিনী অর্থাৎ বি এস এফও সাজো সাজো
এর প্রস্তুতির দিকে আরম্ভ করল। শুরু হয়ে
গেল সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে গোলাগুলি
বিনিময়। এবং, প্রায় প্রতিদিনই এই ঘটনা
বেড়ে চলল।
এর আগে কিন্তু আরও কতকগুলি ঘটনার ঘটে
গিয়েছে। প্রথম সবচেয়ে বড় ঘটনা হল,
পশ্চিমে পাকিস্তানের পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি।
অক্টোবরেই দেখা গেল পাকিস্তান প্রায়
বারো ডিভিশন সৈন্যকে সীমান্তে নিয়ে এসে
আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে।
দ্বিতীয় ঘটনা হল, নাসকাম্বলক কাজ করার

জন্য টেনিসোপ্ট লোকদের পূর্ব ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে, আসামে এবং ত্রিপুরায় এই রকম কিছু লোকও ধরা পড়ল। তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে এই ধরনের কয়েক হাজার লোককে পাক কর্তৃপক্ষ পূর্ব ভারতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাদের উপর নির্দেশ ছিল চরম মুহূর্তে এসেই ব্যাপক নাশকতামূলক কাজ সুরু করতে হবে। তাদের এও মোটামুটি বলে দেওয়া হয়েছিল যে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি চরম মুহূর্ত আসবে। এই সব থেকে শুনে ভারত সরকার বুঝেছিলেন, পাকিস্তান যুদ্ধ করবেই। তাই অক্টোবর মাসে ভারতীয় প্রস্তুতিও বেশ চুরান্বিত করা হল। পূর্ব ভারতেও। পশ্চিম ভারতেও। ভারত তখন যে রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা বা আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সামরিক প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছিল। পশ্চিমের পাক প্রস্তুতি দেখে এবং নাশকতামূলক কাজের লোক ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত অক্টোবরেই মোটামুটি পরিষ্কার বুঝে গিয়েছিল, পাকিস্তান রাজনৈতিক সমাধানের দিকে যাবে না, বরং লড়াই-ই করবে। তাই তখন থেকেই ভারতের প্রস্তুতি জোরদার হয়েছিল।

প্রস্তুতি বিশেষ করে প্রয়োজন ছিল আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার জন্য। এইদিকে ভারতের প্রায় ষাট হাজার সৈনিকের জন্য গোলা ও গোলাবারুদ প্রয়োজন ছিল। অবশ্য, এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ত্রিপুরায় আবার বিদ্যুৎ অঞ্চলে কোনও রেলপথও নেই। মিজো পাহাড়ে ও প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল। মিজোপাহাড়-কাছাড়ের সীমান্তে কোনও যানবাহনই পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া প্রয়োজন ছিল রিজ তৈরীর নানা সাজসরঞ্জামও। ভারত কখনও এই রকম নদীমাতৃক দেশে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়নি। তাই বাংলাদেশে লড়াই করার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতরকে নদীনালা অতিক্রমের কথাও ভাবতে হল। সেজন্যও প্রয়োজন হল বিরাট প্রস্তুতি। নদীপথে বিরাট বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হতে পারে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় পূর্বাঞ্চল বাহিনী অনেক হাজার নৌকা তৈরী করে রাখল। এরই কিছু নৌকা হল ফেরিবোটের কাজচালানি। আর কিছু নৌকা হল সেতুপথে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই নৌকাগুলি আর যুদ্ধের কাজেই লাগেনি।

এই সব ঘটনার পর ভারত সরকার যখন দেখলেন যে পাক বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরার গ্রামগুলির উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তখন তাঁদের আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, পাকিস্তান যুদ্ধ করতে চায়। তখন থেকে তাই সামরিক প্রস্তুতি আরও বাড়ানো হল।

ওদিকে সীমান্তের এপারে পাক হানাদার বিমানের ভিড় বেড়ে চলল। রুদ্র রুদ্র বোমারুরা অনবরত হানা দিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের বেতারে মুক্তিবাহিনীর অভ্যুদয় ঘটে বসল, সীমান্তের ভিতরে ভারতীয় এলাকার পাক হামলাও তাই বাড়তে থাকল। প্রচণ্ড যুদ্ধোন্মাদনা চলল সুধু এই সীমান্তের নানা প্রদেশে। পাকিস্তানী প্রথম প্রথম হানা মরীয়া চালাচ্ছিল কেন এবং তাদের যুদ্ধোন্মাদনার কারণ

ভারতীয় বাহিনীর একজন অফিসারের কাছে ভারতীয় অঞ্চলের দখলীকৃত অংশ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারিখ ছিল নভেম্বর—ডিসেম্বর।

দর্শনা সিমান্তে ভোর ৬টায়ের একদল মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম পদক্ষেপ। পরনের সিভিল কাপড়ের জন্য সিমান্ত পেরুবার পর এ দলের সিভিলিয়ানের মত চলে—অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে।

পরের ছবিতে ভারতীয় অফিসারের চুয়াডাঙ্গার পথে চলেছেন। তারিখ ছিল ৭ই নভেম্বর, ৩ দিনের মধ্যেই মুক্তিলাভ করে।

সুরু করল। সীমান্তের ওপারে বসেই পাকিস্তানীরা ভারতীয় সীমান্তের এপারে কামানের গোলা ছুড়ে চলল। তখন তাদের লক্ষ্য আর মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান নয়। তখন তারা সোজা ভারতীয় ঘাঁটির উপর আক্রমণ সুরু করেছে।

নভেম্বরের দোড়ায় পাকিস্তানীরা ত্রিপুরায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সুরু করল। তারা গোলাগুলি চালাল প্রধানত আখাউড়া অঞ্চল থেকে। এই গোলাবর্ষণে কমলপুর শহর এবং আশপাশের কতকগুলি গ্রাম বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীও নিয়মিত এর জবাব দিল। ওদিকে তখন মুক্তিবাহিনীও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইন ও সড়ক পথ কেটে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আখাউড়ার কাছে পাকিস্তানীরা একটা বড় ঘাঁটি করেছিল। এর কারণও ছিল। বাংলাদেশের প্রধান সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আখাউড়ার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম-ঢাকা-শ্রীহট্ট, ময়মনসিং রেলপথে আখাউড়া প্রধান জংশন। রেলপথ চট্টগ্রাম থেকে এসে আখাউড়ায় দুভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা উত্তর পূর্বে চলে গিয়েছে শ্রীহট্টের দিকে। আর একটা মেঘনা নদী ডিঙ্গিয়ে উত্তরে গিয়েছে ময়মনসিংহের পথে। দক্ষিণে লাইনটা গিয়েছে চাকায়। আখাউড়া তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ভারতের একেবারে লাগোয়া।

পাক সমরনায়করা জানত, সুযোগ পেলেই মুক্তিবাহিনী আখাউড়া দখল করে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে বাংলাদেশের বাকিবাকি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তারা আরও জানত, পিছাই হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে আখাউড়া দখলের চেষ্টা করবে। তাই তারা আখাউড়ায় বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। এবং এই শক্ত ঘাঁটি থেকেই ত্রিপুরার নানা এলাকায় অবিরামে গোলাবর্ষণ করছিল।

কিছুটা দক্ষিণে বেলীয় তাদাতাড়ি তারা আর একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করেছিল। একই উদ্দেশ্য, চট্টগ্রাম-ঢাকা-শ্রীহট্ট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় বাধাদান। এই বেলীয় ঘাঁটি থেকেও পাকিস্তানীরা ভারতীয় এলাকার উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালানো সুরু করল।

পাঁচ ছয়দিন এইভাবে চলার পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী দেখল এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটিগুলি দখলে করে নিয়ে না এলে এই গোলা বর্ষণ বন্ধ করা যাবে না। কারণ, পাকিস্তানীরা কনক্রিটের বাঙ্কার তৈরী করে তার ভেতরে বসে গোলা চালাচ্ছে। দূর থেকে

সীমান্তে বাঙ্কার থেকে পাক-গোলার অবিরাম হানা

গোলা ছুঁড়ে কনক্রিটের বাঙ্কারকে ঘায়েল করা যাচ্ছে না। তাই পূর্ব সীমান্তের ভারতীয় সৈনাবাহিনী তখন এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটি দখল করার অনুমতি চাইল দিল্লিতে। সময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিল্লিও সেই অনুমতি দিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হল আক্রমণ। ৮ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী পাক ঘাঁটিগুলিতে জোর আঘাত হানল। পাকিস্তানীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলি ছেড়ে তাদের পালাতে হল।

এই আক্রমনের দুটো প্রত্যক্ষ ফল হল। প্রথমত, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার উপর কামানের গোলা বর্ষণের ততটা ক্ষমতা আর পাকিস্তানীদের থাকল না। দ্বিতীয়ত, মুক্তি বাহিনীও আরও জোরে পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ করার সুযোগ পেল। কারণ, পাক বাহিনী তখন নয় ঘাঁটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে।

গোলাগুলি বিনিময় যেমন বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে চলছিল তেমনি চলছিল পশ্চিম প্রান্তেও। পশ্চিম প্রান্তে সবচেয়ে বেশি চলছিল তিনটি এলাকায়—বালুরঘাটে, হেলতে এবং বয়রায়। অক্টোবরের শেষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই পাক বাহিনী এই অঞ্চলে হানা দিচ্ছিল। বিভিন্ন ভারতীয় গ্রামের লোক পাক গোলা বর্ষণের ফলে মারাও যাচ্ছিলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পাকিস্তানীরা এই তিনটি ঘাঁটির উপর বড় বড় কামানের গোলা বর্ষণ সুরু করল। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীরা তার জবাবও দিচ্ছিল। কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা দেখা দিল পাকিস্তানীরা বাঙ্কারের ভেতো বসে দূরে পাল্লার কামান চালাচ্ছে। তখনও তখনও সেই কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে এসে ভারতীয় গ্রামগুলির উপরও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে এখানেও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে হল।

বয়রা অঞ্চলে সীমান্ত হল কপোতাক্ষ নদী। বয়রা থেকে একেবারে সোজা রাস্তা বয়রা-হেরোর মধ্যেই খুলার ক্যানটনমেন্ট। ভারতীয় সেনাবাহিনী কপোতাক্ষের পশ্চিম পারে জড় হতেই খুলার ক্যানটনমেন্ট থেকে পাক সেনাবাহিনীও এগিয়ে এসেছিল। কনক্রিটের অসংখ্য বাঙ্কারও তৈরী করেছিল। এবং, সেইসব বাঙ্কার থেকেই গোলা চালাচ্ছিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী তখন দিল্লির নতুন

নির্দেশ পেয়ে গিয়েছে। সেই নির্দেশের
মর্মকথা, ভরোজন হলে সর্বত্র এগিয়ে গিয়ে
ওদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়ে আসবে।
যেন ওইসব ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালিয়ে ওরা না
এপারের মানুষ মারতে পারে। ভারতীয় বাহিনী
তাই কলোতোক্ষ অতিক্রম করে এগিয়ে গেল।
সেদিন ২১ নভেম্বর।
ওদিক থেকে এগিয়ে এল পাকবাহিনীও।
সঙ্গে নিয়ে এল ১৪টা চীনা সাফি ট্যাঙ্ক।
ভারী ভারী কামান। এবং, প্রায় পাঁচ
হাজার সৈন্য।
সুরু হল তুমুল লড়াই। ভারতীয় বাহিনীও
বাধ্য হয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছিল।
ট্যাঙ্কে, কামানে, মেসিনগানে প্রচণ্ড যুদ্ধ
হওয়ার পর দেখা গেল প্রথম রাত্রির লড়াইয়ের
শেষে পাকিস্তানের ছটা সাফি ট্যাঙ্কই ঘায়েল।
গোটা আটেক সিদ্ধু হটে পালিয়েছে।
ভারতীয় বাহিনী কিন্তু সেখানেই পাক
বাহিনীকে ছাড়ল না। আরও এগিয়ে গেল।
জগন্নাথপুর এবং গরীবপুর ছাড়িয়ে।
পাক সেনাবাহিনী ওখানেও বেশ শক্ত প্রতিরক্ষা
যুদ্ধ তৈরী করেছিল। দ্বিতীয় দিন আরও
বড় লড়াই হল। এবং সেখানে আরও সাতটা
পাকিস্তানী সাফি ট্যাঙ্ক ঘায়েল হল।
দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ে পাকিস্তান তার বিমান
বাহিনীকে পুরোপুরি ভাবে আসরে নামাল।
প্রথম দিনের লড়াইয়েই পাক বিমানবাহিনী
যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেশি ক্ষণের জন্য নয়।
ভারতীয় বিমানবাহিনী আসার আগেই তারা
পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন পাক বিমানবাহিনীর
বিমান আকাশে ওড়া মাত্র ভারতীয় বিমানও
আকাশে উঠল। সুরু হল বিমান যুদ্ধ।
দুপুরে বেলা। তিনখানা পাক সাবরের জেট
ধ্বংস হল সেই লড়াইয়ে।
তেরটা ট্যাঙ্ক, তিনখানা বিমান এবং বেশ কিছু
সৈন্য সমেত হারিয়ে পাক সেনাবাহিনী ক্ষয়ে
গেল। ভারতীয় সেনাবাহিনী আর
এগোয়নি। কারণ, তখনও দিল্লি থেকে তেমন
নির্দেশ আসেনি। তবে, জগন্নাথপুর আর
গরীবপুর ছেড়েও তারা চলে এল না।
ওইখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসে রইল।
এখানেও একই ফল হল। ভারতীয় গ্রামের
উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ হল। মুক্তিবাহিনী
ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে আক্রমণ করার
সুযোগ পেল।
এই পর্যায়ে তৃতীয় বড় লড়াই হয় বালুরঘাটে।
পূর্বে যেমন আখাউড়া পশ্চিমে তেমনি ছিলি।
বালুরঘাট অঞ্চলটা একটা কুজের মত
এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের ভেতরে।
এই কুজেরই শীর্ষবিন্দু হল ছিলি।
ছিলি শহরটা পশ্চিম বাংলার ভেতরে, কিন্তু ছিলি
রেল স্টেশন বাংলাদেশের মধ্যে। এই ছিলি
স্টেশন হয়েই চলে গিয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম

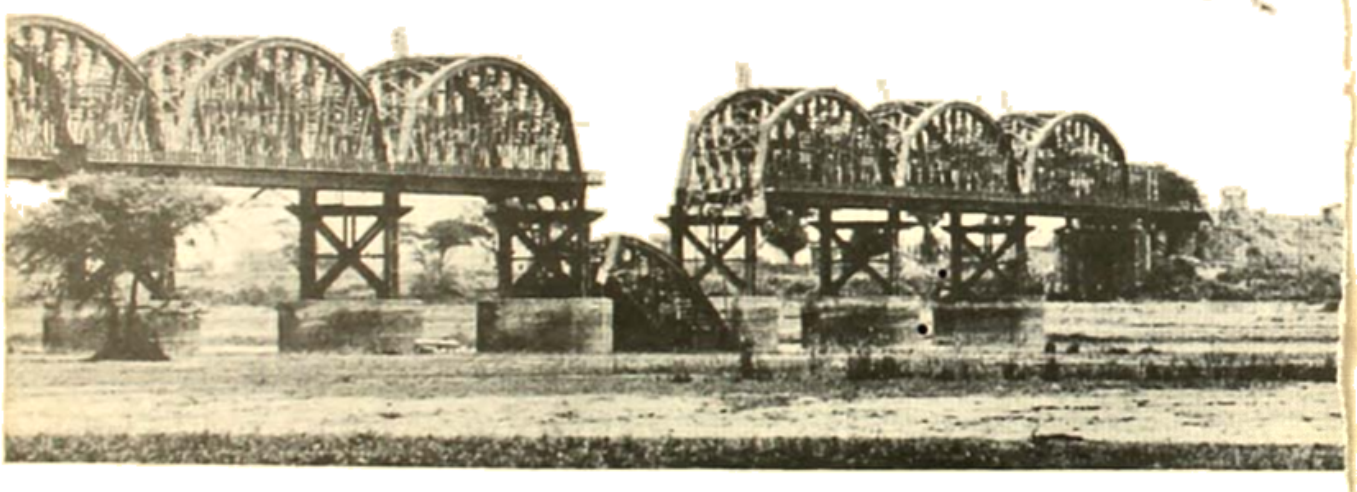

ছিলিতে রেল লাইন পার হয়ে পাক আর্মি
সাবলেজ পালিয়েছে।
পাকা সেতুটার সমস্ত ঘাঁটির ছিদ্র
ওইভাবে তৈরী করেছিল। তাতেও
শত্রু একটা গাড়ীও ওপারে যেতে পারেনি।

প্রধান রেলপথ—যে রেলপথ বাংলাদেশের
উত্তর অংশের সঙ্গে বাকিবাকি অঞ্চলের যোগাযোগ
রক্ষা করছে।
মুক্তিযুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
পাকবাহিনী বুঝেছিল মুক্তিসেনারা এই রেলপথটা
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে।
তাই, সুরু থেকেই তারা ছিলি স্টেশনে একটা
শক্ত ঘাঁটি তৈরী করল। মুক্তিসেনারা কিন্তু
তৎসত্ত্বেও সুরু থেকেই ছিলির উপর আক্রমণ
চালাচ্ছিল। অবশেষে সেপ্টেম্বর ভারতীয়
প্রতিরক্ষা বাহিনীও বালুরঘাট অঞ্চলে একটা

বড় ঘাঁটি তৈরী করল। পাকিস্তানীরাও ততদিনে হিলির ঘাঁটি আরও শক্ত করেছে। খুব বড় বড় এবং বেজায় রকমের মজবুত জমাট বাঙ্কার তৈরী করেছে হিলির চতুর্দিকে। এমনকি রেল ওয়াগন দিয়েও ওরা কয়েকটা শক্ত বাঙ্কার তৈরী করেছিল।

সময় সীমান্তে যখন প্রবল উত্তেজনা এবং গোলাগুলি চলছে সেই সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ কুড়ের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বালুরঘাটের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ সুরু করল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ব্যাপারটা শুধু গোলাবর্ষণে সীমাবদ্ধ রইল। তারপর তারা এগোবার চেষ্টা করল তাদের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য, দক্ষিণ দিক থেকে প্রচন্ড আক্রমণ করে ঐ কুড়টা কেটে দেওয়া এবং এইভাবে বালুরঘাটের ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিটাকে মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এজন্য তারা বাংলাদেশের ধামরাহাট এবং সাপাহারের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে ট্যাঙ্ক এবং ভারী কামান নিয়ে ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ারও চেষ্টা করল।

ওদিকে ভারতীয় বাহিনীও তখন চুপচাপ বসে নেই। কুড়ের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি দেখেই তারা শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যটা বুঝে গিয়েছিল। এবং সেইমত প্রস্তুতও হচ্ছিল।

নভেম্বরের শেষদিকে এই অঞ্চলে একটা মুখোমুখির লড়াই-ই সুরু হয়ে গেল। প্রথম প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী শুধু ঘাঁটিতে বসেই পাকিস্তানী গোলার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল, ভারতীয় বাহিনীও তখন ট্যাঙ্ক নিয়েই এগিয়ে গেল। ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর গোটা অঞ্চল জুড়ে বড় ধরের ট্যাঙ্কের লড়াই হয়ে গেল। এবং শেষ দিনের লড়াইয়ে পাক সেনারা এত মার খেল যে ধামরাহাটের দিক থেকে পালাতে বাধ্য হল। এই যুদ্ধে পাকিস্তান মোট সাতটা ট্যাঙ্ক হারাল। কিন্তু ট্যাঙ্ক হারিয়ে বা লড়াইয়ে বড় মার খেয়েও পাকবাহিনী হিলি স্টেশনের ঘাঁটি ছাড়তে চাইল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রথমে হিলি স্টেশন দখল করার জন্য যেমন

হাঁটুর ছিলে ওপর পাক ফৌজের একটা ভারি খোঁড়া ট্যাঙ্ক।

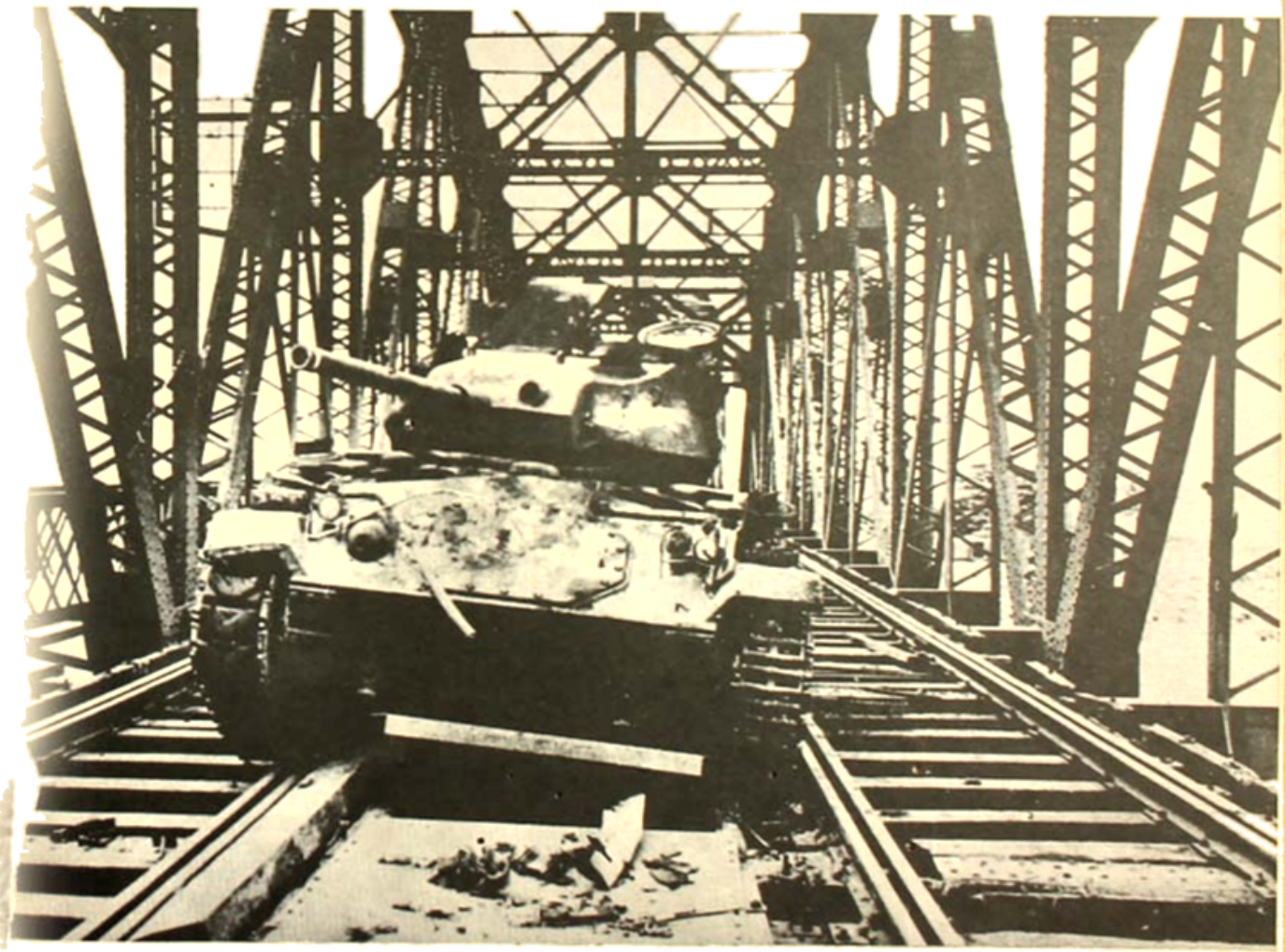

ভাবে অগ্রসরও হল না।

এইভাবে গোটা সীমান্তে অঘোষিত লড়াই চলতে চলতেই সুরু হয়ে গেল পুরোদস্তুর যুদ্ধ ঘোষিত পাক-ভারত লড়াই। এবং লড়াই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের চতুর্দিক দিয়ে এগিয়ে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

নিয়াজি তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখল। এবং এই সর্ষে ফুল দেখার ফলেই বাংলাদেশের পাক সেনানায়ক ইসলামাবাদ থেকে পূর্ণ যুদ্ধের হুমায় খবর পেয়েও তার রণকৌশল পাল্টালো না। তখনও তার সেনাবাহিনী এবং কামান বন্দুক গোটা দেশের সীমান্তেই ছড়ানো রইল। এবং তখনও নিয়াজি সীমান্তেই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য ব্যস্ত। এর মধ্যেও কিছুটা ব্যস্তের মধ্যের পরিচয় দিল পাক নবম ডিভিসনের প্রধান জেনারেল আনসারি। তার সদর ঘাঁটি ছিল জেসোর ক্যানটনমেনটে। ৩ ডিসেম্বরই জেসোর থেকে নবম পাক ডিভিসনের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আরও বেশ কিছুটা ভেতরে—যশোরে। সোনা যায় সেটাও প্রধানত কামানের গোলা খাওয়ার ভয়ে। গরীবপুরের লড়াইয়ের পর যেসব জেসোর ক্যানটনমেনট ভারতীয় কামানের রেঞ্জের মধ্যে এসে গিয়েছিল। নবম পাক ডিভিসনের হেড কোয়ার্টার জেসোর থেকে সরল; কিন্তু সৈন্যসামন্ত যেমন সীমান্তে ছিল তেমনি রইল। তখনও পাক সেনা নায়কদের সংকল্প, বাঙ্কারে বসে বসে গোলা চালিয়েই পাক সৈন্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করবে।

যেকোনও মুহূর্তে পাকিস্তান সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এখবর নভেম্বরের শেষ দিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী পেয়েছিল। তাই যে কোনও মুহূর্তে লড়াইয়ে নামার জন্য ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রস্তুত ছিল। ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাক বিমানবাহিনী যখন অতর্কিতে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তার জবাব পেতেও মোটেই দেরি হল না। দুই সীমান্তেই জবাব গেল সঙ্গে সঙ্গে। পূর্বেও। পশ্চিমেও।

সুরু হল পূর্ণ যুদ্ধ। এবং সেই সঙ্গেই সুরু হল প্রতিদিনের যুদ্ধের ইতিহাস

ডিসেম্বর। ১১ ডিসেম্বর ভারতীয় অগ্রবর্তী সেনাদল থেকে ছবিটি সংগ্রহ করেছেন

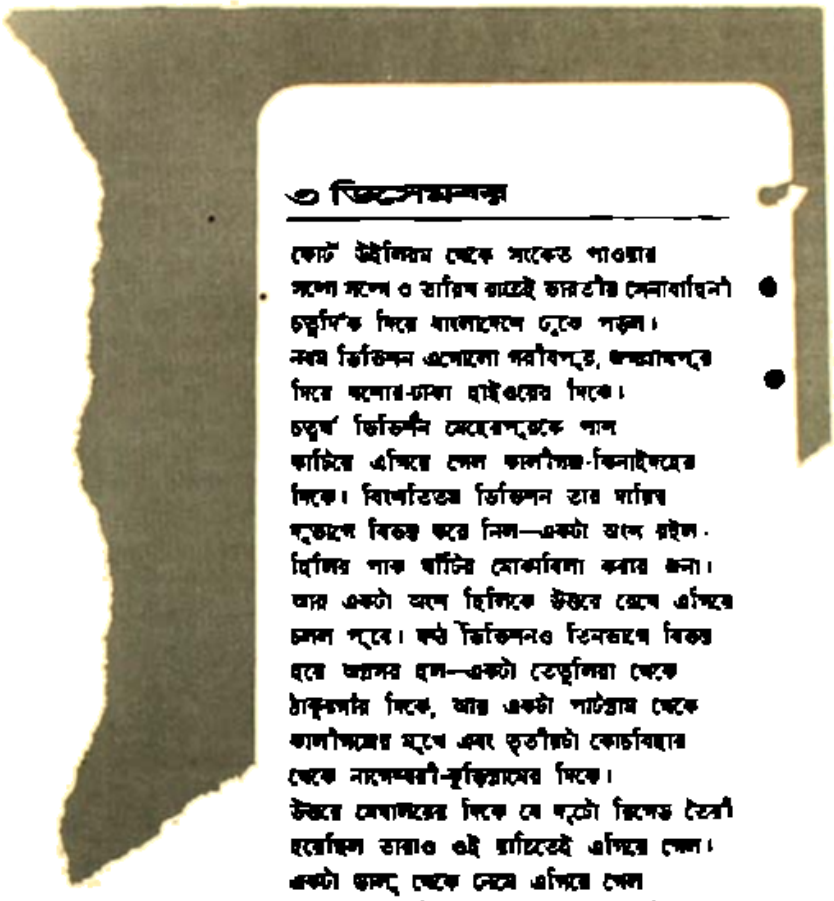

৩ ডিসেম্বরসন্ধ্যা

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩ তারিখ রাত্রেই ভারতীয় সেনাবাহিনী চতুর্দিক দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ল।
নবম ডিভিশন এগোলো গরীবপুর, জলঢাকাপুর দিয়ে জলোর-ঢাকা হাইওয়ের দিকে।
চতুর্থ ডিভিশন মেহেরপুরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল কালীগঞ্জ-কিনাইদহের দিকে। বিশাখাতত্ত্ব ডিভিশন তার দায়িত্ব সুভাগে বিভক্ত করে নিল—একটা অংশ রইল দ্বিলির পাক ঘাঁটির মোকাবিলা করার জন্য। আর একটা অংশ দিলিকে উত্তরে রেখে এগিয়ে চলল পূবে। ষষ্ঠ ডিভিশনও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হল—একটা তেতুলিয়া থেকে ঠাকুরগাঁর দিকে, আর একটা পাটগ্রাম থেকে কালীগঞ্জের মুখে এবং তৃতীয়টা কোচবিহার থেকে নাগেশ্বরী-কুড়িগ্রামের দিকে।
উত্তরে মেঘালয়ের দিকে যে দুটো ডিভিশন তৈরী হয়েছিল তারাও ওই দায়িত্বেই এগিয়ে গেল। একটা জাদু থেকে নেমে এগিয়ে গেল জামালপুরের দিকে। আর একটা, এক ব্রিগেড উল্লেখ, একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হালুয়াঘাটের মুখোমুখি।
পূর্ব দিক থেকেও একই সঙ্গে ৮, ৫৭ এবং ২০নং ডিভিশন নানাভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকল। একটা বাহিনী এল সোনামসজিদ থেকে সিলেটের দিকে। ছোট ছোট তিনটা বাহিনী এগিয়ে চলল হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারের পথে। আখাউড়াকে সোজাসুজি আঘাত করে একটা মোটা ব্রিগেডই এগিয়ে চলল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে।
ওদিকে কুমিল্লার সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানীদের বেশ একটা বড় ঘাঁটি ছিল। কুমিল্লা সেক্টরের দায়িত্ব ছিল আমাদের ২০নং ডিভিশনের উপর। যুদ্ধ সুরু হতেই ২০নং ডিভিশন কুমিল্লা শহরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল দাউদকান্দির দিকে।
সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে গেল মাত্র কয়েক কোম্পানী সৈনিক। এই ২০নং ডিভিশনেরই আর একটা ব্রিগেড চৌদ্দগ্রাম থেকে অগ্রসর হল লাকসামের দিকে। লক্ষ্য চাঁদপুর। পাক বাহিনীও এই আক্রমণ আঁচ করে লাকসামে একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছিল। এখানেও ভারতীয় বাহিনী সেই একই কৌশল নিল।
লাকসামের পাক ঘাঁটিকে বাস্ত রাখার জন্য একটা ছোট্ট বাহিনীকে রেখে মূল ব্রিগেডটা এগিয়ে চলল চাঁদপুরের দিকে।
পূবে আর একটা বড় বাহিনী এগোলো কিলোমিয়া দিয়ে ফেনীর দিকে। লক্ষ্য চট্টগ্রামে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া। এই বাহিনীরও সেই একই কৌশল। ফেনীতে পাকিস্তানীরা বেশ বড় ঘাঁটি তৈরী করেছিল। সুতরাং সেই ঘাঁটি দখল করার জন্য ভারতীয় বাহিনী কোনও চেষ্টা করল না। একটা ছোট্ট বাহিনীকে রেখে যাওয়া হল ফেনীর পাক সৈন্যদের বাস্ত রাখার জন্য। আর মূল বাহিনীটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ পশ্চিমে।
পশ্চিম প্রান্তে বিমান হামলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিমান এবং নৌবাহিনীও আসরে নেমে পড়ল। বাংলাদেশে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর অ্যাকসন সুরু হল ৩রা মধ্যরাত্রি থেকে। বিমান ও নৌবাহিনীর জলী বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাক ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাল।
প্রধান লক্ষ্য ছিল অবশ্য ঢাকা আর চট্টগ্রাম। ঢাকা ছিল পাক বিমানবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। এই ঘাঁটিতেই ছিল তাদের জলী বিমানগুলি।
প্রথমে বাংলাদেশে পাক বিমানবাহিনীতে ছিল দুই স্কোয়াড্রন বা ২৮টা জলী বিমান—এক স্কোয়াড্রন চীনা মিগ-১৯, আর এক স্কোয়াড্রন মার্কিনী সাবার জেট।
যুদ্ধ সুরু হওয়ার কিছু দিন আগে ইয়াহিয়া খাঁ নির্দেশে মিগ-১৯ বিমানগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল। বাংলাদেশে থাকল সুধু সাবারগুলি। তারও কয়েকটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল মরার লড়াইয়ে।

বাংলাদেশে হামলা শুরু হতেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম লক্ষ্য হল পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানগুলিকে শেষ করে দেওয়া। যাতে মাটিতে শত্রুপক্ষ কিছুই না করতে পারে। যাতে লড়াইয়ের শুরুতেই আকাশটা মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ৩রা মধ্যরাত্রে ভারতীয় বিমানবাহিনী একেবারে ভোরেলাও বিমান বন্দর আক্রমণ করল। ঐ বিমান বন্দরেই পাকিস্তানের সব সাবারজেট মজুত ছিল। কারণ শুধু বাংলাদেশে তখন ওই একটি মাত্র বিমান বন্দর যেখান থেকে জেট বিমান উড়তে পারে।

ভারতীয় মিগ সেই ঘাঁটিতে হানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী সাবার জেটগুলিও বাজা দিতে এগিয়ে এল। প্রায় সারারাত ধরে চলল চারশ বিমানযুদ্ধ। প্রথম রাতির আক্রমণেই পাকবাহিনীর অর্ধেক বিমান ধ্বংস হয়ে গেল। বিমান বন্দর এবং কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টেও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিন যে শুধু ঢাকা আক্রমণ করেছিল তাই নয়। আক্রমণ করেছিল কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার প্রভৃতি এলাকারও। চট্টগ্রাম, চালনা, কক্সবাজার এবং চাঁদপুরের অভিযান চালিয়েছিল প্রধানত নৌবাহিনীর বিমানগুলি। চট্টগ্রাম নৌবন্দরের প্রায় অর্ধেকটাই ধ্বংস হয়ে গেল। বন্দরের তেলের ডিপোগুলিও জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

এর আগে পাক বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি একবার কলকাতা শহরেও হানা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই তাদের ফিরে যেতে হল। প্রত্যুষের বিমানবাহিনীর বিমানগুলি সেদিন প্রায় সারা রাত ধরে কলকাতা শহরকে পাহারা দিয়েছিল।

৪ ডিসেম্বরকে

৪ ডিসেম্বর সকালে প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধানরা আলোচনায় বসে দেখলেন ভারতীয় বাহিনী পূর্বাঞ্চলে ঠিক ঠিকই এগিয়েছে।

প্রথমত, তারা কোথাও শহর দখলের জন্য অগ্রসর হয়নি।

দ্বিতীয়ত, কোথাও বড় পাক ঘাঁটির সঙ্গে বড় লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েনি।

তৃতীয়ত, পাকিস্তানী সমরনায়করা তখনও বুঝতে পারেন ভারতীয় বাহিনী ঠিক কোন দিক দিয়ে ঢাকা পৌঁছতে চাইছে। বরং, তখনও তারা মনে করছে ভারতীয় বাহিনী সব দিক দিয়েই রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং, তখনও ভাবছে ভারতীয় বাহিনী সীমান্তের বড় পাক ঘাঁটিগুলির উপরই আক্রমণ চালাবে।

চতুর্থত, ব্যাপক বিমান এবং স্থল আক্রমণে শত্রুপক্ষকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেওয়া গিয়েছে।

প্রথমত, পাক বিমানবাহিনীকে অনেকটা ঘায়েল করে ফেলা হয়েছে। তাদের বিমান ঘাঁটিগুলিও বিধ্বস্ত।
দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের প্রধান নৌবন্দরগুলি অর্থাৎ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চালনা, চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জে জাহাজ বা স্টীমার ভেড়াবার ব্যবস্থাও অনেকটা বিপর্যস্ত। এবং
সপ্তমত, বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক এবং বাড়িঘরও মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।
সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী তাই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেও পূর্ব লক্ষ্য মতই এগিয়ে চলল।
পশ্চিম দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিফৌজের সব কটা কলাম পূবে এগিয়ে চলল। কিন্তু তোষাও তারা সোজাসুজি পাক ঘাঁটিগুলির দিকে এগোলো না। মূল বাহিনী সর্বদাই ঘাঁটিগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। এবং, ঘাঁটিতে অপেক্ষমান পাকবাহিনী যাতে মনে করে যে ভারতীয় বাহিনী তাদের দিকেই এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে সেইজন্য প্রত্যেক পাক ঘাঁটিতে অবিরাম গোলাবর্ষণও চলতে থাকল।
এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পাক ঘাঁটির সামনে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু কিছু লোক রেখে যাওয়া হল।

ওদিকে মূল ভারতীয় বাহিনী যে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানীরা সে খবরও পেল না। কারণ, প্রথমত, তাদের সমর্থনে যেসব লোক ছিল না, যারা খবরাখবর দিতে পারে।
দ্বিতীয়ত, তাদের বিমানবাহিনীও তখন বিধ্বস্ত। ফলে সর্বত্র উড়ে থাকে বিমান ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির খবরাখবর পাক সেনাবাহিনীকে জানাতে পারল না।
তৃতীয়ত, বাংলাদেশে পাক বাহিনীর বেতারে খবরাখবর-পাঠাবার ব্যবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। সুতরাং, নিজস্ব ব্যবস্থায়ও তারা খবরাখবর পেল না।
তাই ভারতীয় বাহিনী যখন সোজাসুজি আখাউড়া, হিলি, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ফেনী প্রভৃতি নয় পাক ঘাঁটির দিকে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তখন পাক বাহিনীর অধিনায়করা তা মোটেই বুঝতে পারল না। বরং, ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের বহর দেখে তখনও তারা মনে করছে ভারতীয় বাহিনী সোজাসুজিই এগোবার চেষ্টা করছে।
সেইজন্য তখনও তারা মূল সড়কগুলি আগলে বসে রইল। সীমান্তের কাছাকাছি শহরগুলিতে তখনও পাক বাহিনী প্রতিষ্ঠিত—একমাত্র কুষ্টিয়া ছেলার দর্শনা ছাড়া।
দর্শনা যে মুহূর্তে আমাদের হাতে পড়ল তখন ডিভিশনের কমান্ডের পাল্লার মধ্যে এসে গেল পাকিস্তানীরা তখন শহর ছেড়ে প্রাণ পড়িমরি পালাল।
এদিকে তখন ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনেও ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর ৯০টি বিমানগুলি বার বার ঢাকা, চট্টগ্রাম, চালনা প্রভৃতি এলাকার সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালাল। ঢাকার সেদিনও কোন বিমান যুদ্ধ হল। কিন্তু সেইদিনই প্রায় সব বিমান যুদ্ধ। অধিকাংশ পাক বিমানই ঘায়েল হল। বিমান বন্দরগুলিও প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল।
ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীও প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রধান সড়ক এবং পাক ঘাঁটিগুলি এড়িয়ে। তখনও পর্যন্ত প্রধান লক্ষ্য, বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়ানো পাকবাহিনীকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং আবার যাতে একত্র হয়ে ঢাকা রক্ষার জন্য কোনও বড় লড়াইয়ে নামতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।

ভক্তবাদের অন্যান্য শিখরে যেসব ছুটে চলেছেন। হিমবাহিতে বিশ্রামরত যান —যেখানে নীচেই কাশ্মীরের ডাল দেখা যায়।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বাংলাদেশের প্রথমিক যুদ্ধের
প্রধান দুটি পরিকল্পনা। ২১ নভেম্বর
একটিকে মৌক্ত মুক্তির ফটির
লড়াইয়ে পাকিস্তানের তিনটি পাকে
সৈন্যকে ঘেরাওয়ে বন্দী করা।
দ্বিতীয়টি যশোর দখল।
বাহিনী চাপাই। যশোর সদর থেকে
মোট ৩৫৩ টি কাঁচা সৈন্য
বাস্তু বাস্তু সমাবেশ ঘাস ঢাকা ভাঙ্গা
যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যন্ত

ঘেরাওয়ের সময় নির্ধারণ
যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা
করা, ঢাকার সাথে যশোর
এবং মুজনগর এবং
ওয়েলিংটন ঘাঁটির বিচ্ছিন্ন
হল। এরপর বড় লড়াই হল যশোরের
আর একটি হল ঝিনাইদহের কাছে
কোটচাঁদপুরে। দুটো লড়াইয়েই কাজ হিসাবে
বেতার আর রেল এবং ঘাঁটি দুটো
দখলিয়ে ছেড়ে দেয়া হল।
এই দুটো ঘাঁটি দখলের চেয়েও কিন্তু
মিত্রবাহিনীর বড় লাভ হল পাকবাহিনীর
যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দিতে
পারবে। এইটাই ছিল প্রথম পর্যায়ে
বড় লক্ষ্য। যাতে পাক সেনাবাহিনী কিছু
হাটে ফিরে আবার না বিদ্রোহ হয়ে করে
ঢাকা রক্ষার লড়াইয়ের সময় ও মেঘনার
মাঝখানে কোনও নতুন শত্রু যুদ্ধে না যোগ করতে
পারে। বিভিন্ন বড় সড়কে অবরোধ সৃষ্টি
করে মিত্রবাহিনী সৈন্যদলের ঘাঁটিগুলি
পাকবাহিনীর ঢাকার দিকে যেতার পথ বন্ধ
করে দিল এবং

ঢাকার এশিয়া চক্রের
বিচ্ছিন্ন করে মেঘনার মোহনা
করেছেন তবে সেইদিনই সবচে চূড়ান্ত আঘাত
দিল স্থল বাহিনী
স্থল বাহিনী তবে
একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে
অগ্রসর করা হল
এ বিজয়ের সমস্যা যেসবই ছোট চূড়ান্ত সময়,
কাজ অসুবিধে ঘাঁটিতে চলে গেল

৩ ডিসেম্বর

এই নির্দেশ পেয়েই মোটা বাংলাদেশের পাক সামরিকবাহিনী একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। এতদিন তারা সীমান্তে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়েছে, এখন হঠাৎ এল পিছু হটার নির্দেশ! একটা ভায়াসট ক্লাস অরাজক অবস্থা। কিন্তু পিছু হটাও যে তখন সহজ নয়। তারা, এতক্ষণে বিভিন্ন এলাকার পাকবাহিনী খবর পেয়ে গিয়েছে যে, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তারা আরও দেখেছে, আকাশে সদাসর্বদা ভারতীয় বিমান উড়ছে। তবু, তারা কেউ কেউ পুল ব্যাক হুকুম পেয়ে পিছু হটার চেষ্টা করল। ৩ ডিসেম্বর সূর্য ওঠার আগেই কতকগুলি সীমান্ত ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনীর পিছু হটা সুরু হল। কোনও কোনও ঘাঁটির পাক অধিনায়করা আবার আন্তর্জাতিক স্যুইট পাঠিয়ে শেষবের খবর পাঠাবার চেষ্টা করল। এবং, অনেকেই দেখল শেষবের অবস্থাও ভাল নয়। এতে যোগাযোগ বি তার উপর আবার বহু এলাকায় শেষবে গিয়ে ভারতীয়

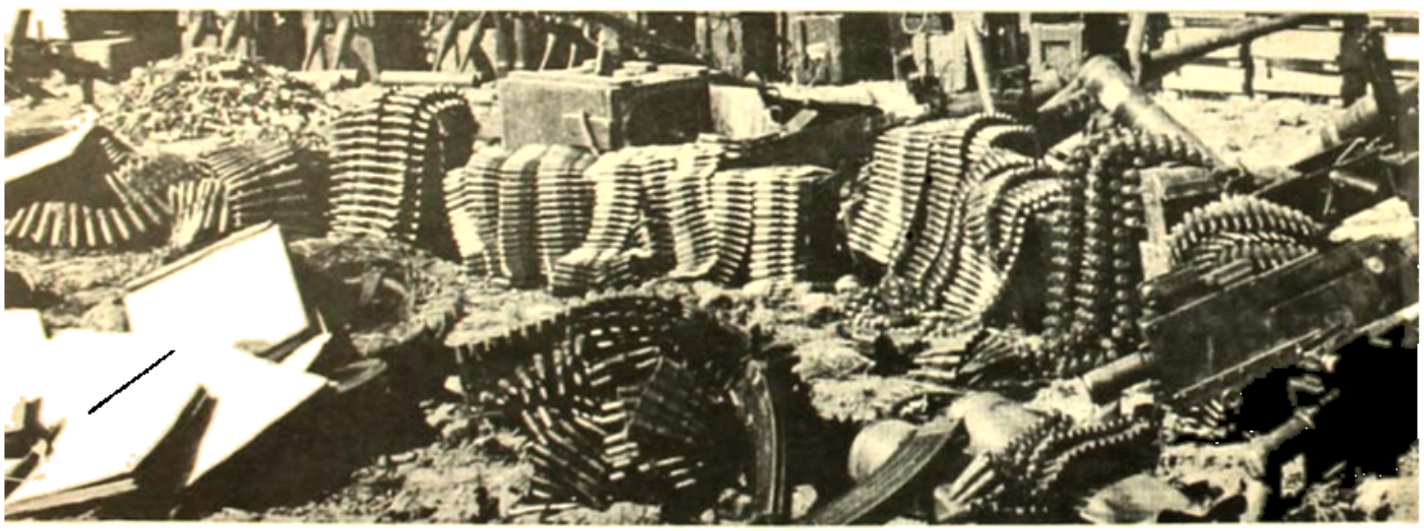

সেনাবাহিনী ঘাঁটি করে বসে গিয়েছে।
নিয়ন্ত্রিক 'পুল ব্যাক' নির্দেশের পর তাই মোটা বাংলাদেশের পাকবাহিনীতে একটা সাঁতিকারের অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হল।
অধিকাংশে পাক সীমান্ত ঘাঁটির সামনেই তখন এক সমস্যা—সীমান্ত ঘাঁটিতে বসে থাকার চেষ্টা করলেও মৃত্যু অনিবার্য, আবার পিছতে

গেলেও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।
একেকটা সীমান্ত ঘাঁটি থেকে তাই নিয়ান্ত্রিকে জানান হল, পুল ব্যাক করার চেয়ে লড় বাঙ্কারে ঘেরা ঘাঁটিতে বসে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।
কুর্মিটোলার নির্দেশ তাই সর্বত্র সমানভাবে পালিত হল না। কোথাও পূর্ণ পুল ব্যাক হল। কোথাও হল আধা-পুল ব্যাক।
কোথাও আবার যেমন ছিল তেমনই রইল।
যেসব ঘাঁটিতে ওরা থেকে গেল সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ময়নামতি, চট্টগ্রাম, জামালপুর এবং হিলি। যেসব ঘাঁটি থেকে পালাল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় শ্রীহট্ট এবং তেলিয়ের। শ্রীহট্ট এবং তেলিয়ের চতুর্দিকে পাকবাহিনী যতগুলি ঘাঁটি তৈরী করেছিল সবগুলিই ছেড়ে পালাল।
পাক নবম ডিভিশনের উপর পশ্চার্ত রক্ষণের গোটা অঞ্চলটা রক্ষার দায়িত্ব ছিল।
আগেই বলা হয়েছে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে লড়াই সুরু হওয়ার আগেই পাক নবম ডিভিশনের সদর দফতর তেলিয়ের ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরিয়ে মাগুরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু নবম ডিভিশনের সৈন্যসামন্ত ঠিকই সীমান্তে ছিল। চৌগাছার পরাজয়ের পর তারা তিনভাগে ছড়িয়ে ছিল। কিনাইদহ-ঝেনেরপুর অঞ্চলে একটা অংশ, কিশোরগঞ্জের উত্তর পশ্চিমে আর একটা অংশ এবং সাতক্ষিরা থেকে খুলনা পর্যন্ত আর একটা অংশ।
৩ ডিসেম্বর মাত্তরাতে ভারতীয় চতুর্থ ডিভিশন আঘাত হানল কিনাইদহের উত্তর-পশ্চিমের পাকবাহিনীর উপর। প্রায় একই সময়ে ভারতীয় নবম ডিভিশন যা ছিল কিশোরগঞ্জ থেকে কিনাইদহের পশ্চিমে ছড়ানো অংশটার উপর।

জলে স্থলে পাক কনভয় দেখলেই আক্রমণ

খুলনার পথে ভারতীয় মৈত্রীবাহিনী

এই দুই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েই পাকবাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এবং দুদিক থেকে মিত্রবাহিনীর জুটো কলাম যশোর-ঢাকা হাইওয়ের ওপর এসে দাঁড়াল।

ততক্ষণে নিরাজির পুল ব্যাক অরডারও এসে গিয়েছে। ৬ ডিসেম্বরের ভোর থেকেই তাই গোটা পাক নবম ডিভিশনের পলায়ন পর্ব সুরু হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল গোটা বাহিনীটাই ঢাকার দিকে পালাবে। কিন্তু তা পারল না। কারণ, ততক্ষণে ভারতীয় চতুর্থ এবং নবম ডিভিশন যশোর-ঢাকা হাইওয়ের জুটো জায়গা ঘাঁটি করে বসেছে। বাধ্য হয়ে তাই পাক নবম ডিভিশনের একটা অংশ পালাল মাগুরা হয়ে মধুমতী নদী ডিঙিয়ে ঢাকার পথে।

আর একটা অংশ পালাল খুলনার দিকে। কুষ্টিয়ার দিক দিয়েও পালাল একটা ছোট্ট অংশ। সাতক্ষিরা অঞ্চলে যে পাকবাহিনীটা ছিল এতদিন তারাই সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল প্রধানত মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা এবং বি এস এফের সেপাইরা। পুল ব্যাক অরডারের সঙ্গে সঙ্গে তারাও পালাল খুলনার দিকে। পালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবকটা বাহিনীই রাস্তার ওপরের সব ব্রিজগুলি ভেঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করল। শ্রীহট্টেও তখন প্রায় একই অবস্থা। দু পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিত্রবাহিনী শ্রীহট্টের পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বদিক থেকে একটা সোলন্দাজবাহিনীও শ্রীহট্টের উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। শ্রীহট্টের পাক সমরনায়কও পুল ব্যাক অরডার পাওয়া মাত্র পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ইচ্ছা ছিল আশুগঞ্জ থেকে মেঘনা প্রতিরক্ষা করে ঢাকার দিকে যাবে। কিন্তু পারল না। কিছুটা পিছিয়েই তখন, সম্ভব নয়—মিত্রবাহিনী তার অগ্রেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তখন গোটা বাহিনীটাকে দুভাগে ভাগ করা হল। একটা থাকল শ্রীহট্টে। আর একটা সেক্টরের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। দু দলই লড়াই চালাল। এবং দু দলই লড়াইয়ে হেরে গেল। শ্রীহট্টের বাহিনীটা বাঙ্কারে বসে বেশ ভালই লড়ল। ওই বাহিনীকে ঘায়েল করতে ভারতীয় বিমানবাহিনীকেও বেশ কয়েক টন বোমাবর্ষণ করতে হল।

সমস্ত বাংলাদেশেই মিত্রবাহিনী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তখনও একই লক্ষ্য—যাতে পিছু হটে গিয়ে পাকবাহিনী কোথাও না জড় হতে পারে, যাতে সীমান্তের কোনও পাক সৈন্য না ঢাকায় পৌঁছতে পারে। একই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের বিমান ও নৌবাহিনীর জলী বিমানগুলিও তখন সমস্ত বাংলাদেশের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। স্থলে বা জলে পাক কনভয় দেখলেই আক্রমণ চালাচ্ছিল। নৌবাহিনী তখন গোটা বন্দীপসাগরেও অবরোধ-বূহ্য রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রে বা নদী পথেও পাক সৈন্যদের পালাবার উপায় নেই।

৭ ডিসেম্বরের

কার্যত যশোরের পতন হয়েছিল আগের দিনই। ৬ তারিখ সন্ধ্যা হতে না হতেই পাকবাহিনীর সবাই যশোর ক্যানটনমেন্ট ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয়বাহিনী তখনই সে খবরটা পায়নি। ৭ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ ভারতীয় নবম ডিভিশনের প্রথম কলামটা উত্তর দিক দিয়ে যশোর ক্যানটনমেন্টের কাছে এসে পৌঁছল। তখনও তারা জানে না যশোর ক্যানটনমেন্ট শূন্য। তখনও তাদের কাছে খবর, পাকবাহিনী যশোর রক্ষার জন্য বিরাট লড়াই লড়বে।

কিন্তু মিত্রবাহিনীর কলামটা যতই এগিয়ে এল ততই আশ্চর্য হয়ে গেল। কোনও প্রতিরোধ নেই। সামনে থেকে একটাও গোলাগুলি আসছে না!

প্রায়-বিহ্বল অবস্থায় তখন কলামটা একেবারে ক্যানটনমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল তখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা। জনা দশ পনেরো লোক "জয়বাংলা" ধ্বনি দিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। জড়িয়ে ধরে তাদের সম্বর্ধনা জানাল। আর জানাল যে, আগের দিনই সব পাক সেনা যশোর ছেড়ে পালিয়েছে।

ভারতীয় বাহিনী তখন গোটা ব্যাপারটা বুঝল। দেখতে দেখতে বেশ কিছু লোক এসে সেখানে জড় হল। তারাই ক্যানটনমেন্টের ভেতরটা চিনিয়ে দিল ভারতীয় বাহিনীকে।

পাক সেনারা যে ট্যাঙ্ক, কামান এবং ট্রাক-জিপ নিয়ে খুলনা পালিয়েছে যশোরের নাগরিকরা তাও ভারতীয় বাহিনীকে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী ছুটল খুলনার পথে।

ওদিকে তখন নবম ডিভিশনের সদর ঘাঁটিতেও সব খবর পৌঁছে গিয়েছে।

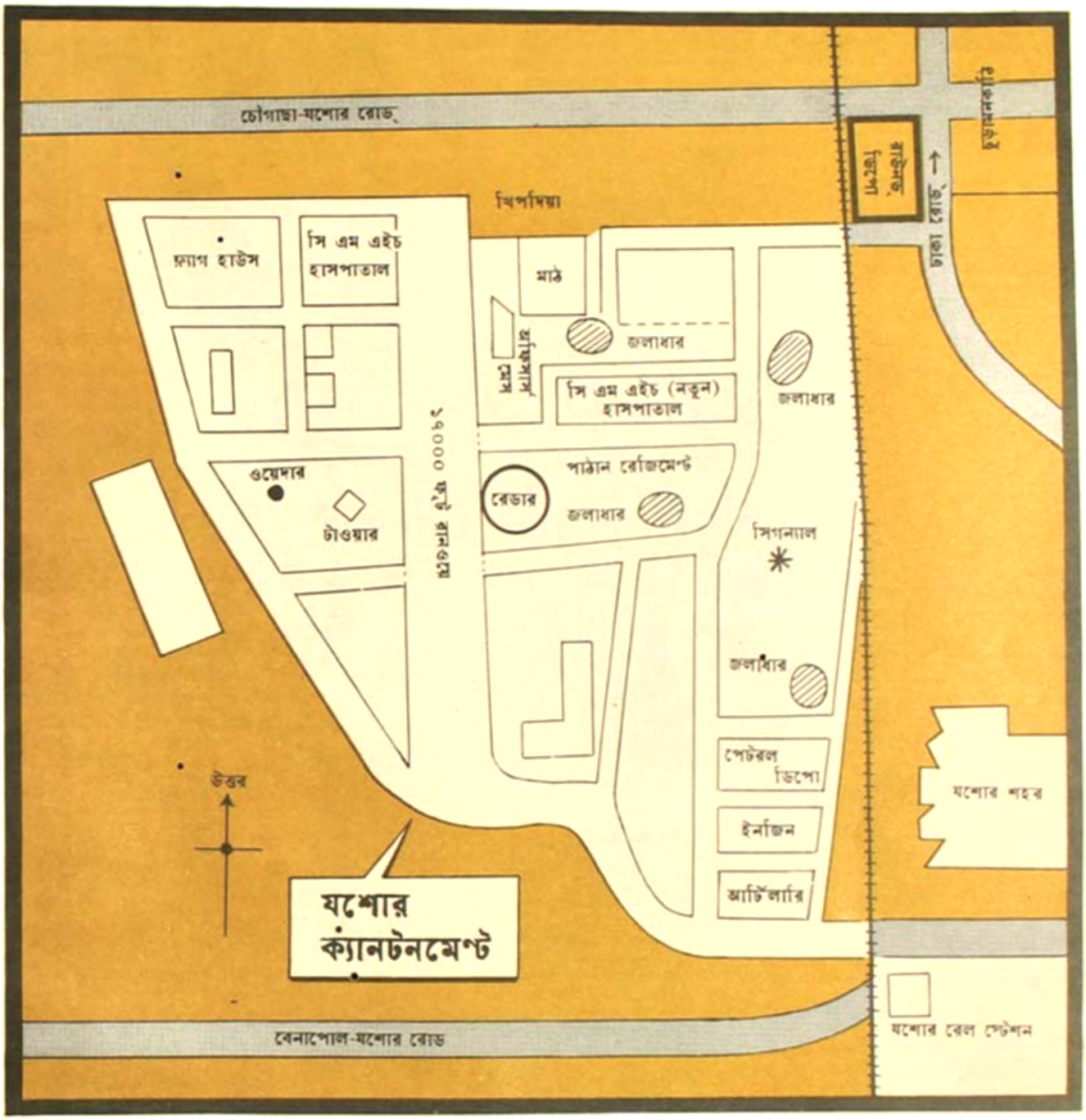

ডিভিশনের প্রধান যে জেনারেল নলবীর সিং বয়রা-ভিকরগাছায় দীর্ঘ ঘুরে গোটা নবম ডিভিশনকে নিয়ে এগিয়ে এলেন যশোর শহরে। যশোর ক্যানটনমেন্টে পাক নবম ডিভিশনের মত আয়ুবের নবম ডিভিশনের সদর দফতর ছিল। শ্রীহট্টেও পতন হল ওইদিনই দুপুরে।

প্রথমে ভারতীয় ছত্রসেনারা নামল শ্রীহট্টের নিকটবর্তী বিমানবন্দর শালুটিকরে। খুব জোরে। তারপর চতুর্দিক থেকে ডিভিশনী শ্রীহট্টের পাক ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাল। দুপুরে বেলাই শ্রীহট্টের পাক সেনানায়ক আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

৮ ডিসেম্বরঃ

বৃহস্পতিবার সকালে মিত্র পক্ষের সামরিক নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করে দেখলেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য সফল হয়েছে। বাংলাদেশের নানাস্থানে পাক সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ। ঢাকার দিকে পালাবার কোনও পথ নেই। পশ্চিমে একটা পাকবাহিনী আটকে পড়েছে খুলনার কাছে। উত্তরের মোটা পাকবাহিনীও ময়মনসিংহ এবং পদ্মার মধ্যবর্তী তিন চারটা অঞ্চলে অবরুদ্ধ। একটা বড় বাহিনী, প্রায় একটা ডিভিশন, সিলেটের কাছে অবরুদ্ধ। আর একটা ডিভিশন আটকে রয়েছে জামালপুরে। ময়মনসিংহ থেকে যে বাহিনীটাকে সরিয়ে শ্রীহট্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটা কার্যত ডিভিসড। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ আর একটা ডিভিসড। আর একটা বড় পাকবাহিনী অবরুদ্ধ চট্টগ্রামে। একের সঙ্গে আর একের যোগ দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ঢাকার দিকে পিছু হটাও কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

মিত্রবাহিনীর কর্তারা তখন তিনটা ব্যবস্থা নিলেন। প্রথম ব্যবস্থায়, মোটা পাক সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হল। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, জেনারেল সগৎ সিংকে বলা হল তাঁর অধীনস্থ তিনটা কলাম খুব দ্রুত ঢাকার দিকে এগিয়ে নিতে। তৃতীয় ব্যবস্থায়, একটা ডিভিসনকে হেলিকপ্টারে সম্ভব ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিক থেকে ময়মনসিংহের দিকে নিয়ে আসা হল। যুদ্ধের সূত্রপাতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ৮ ডিসেম্বর আবার তাঁর সেই আবেদন নানাভাষায় বার বার আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হল।

তিনি পাক সেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস দিলেন যে, আত্মসমর্পণ করলে পাকবাহিনীর প্রতি জেনিভা কনভেনশনের রীতি অনুসারে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে।

জেনারেল মানেকশ বললেন : আমি জানি আপনারা পালাবার জন্য ঘাঁরিপাল এবং নারায়ণগঞ্জের কয়েক জায়গায় জড় হচ্ছেন। আমি এও জানি ওখান থেকে আপনাদের উদ্ধার করা হবে বা পালাতে পারবেন এই আশ্বাসেই আপনারা ওসব জায়গায় গিয়ে মিলিত হচ্ছেন। কিন্তু আমি সমুদ্রপথে আপনাদের পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। একটা নৌ-বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি আপনারা আমার পরামর্শ না শোনেন এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত থেকে জেনারেল সগৎ সিং-এর প্রায় সব কটা ডিভিসনই তখন প্রচণ্ড গতিতে পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছিল। একটা এগোচ্ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করে আশুগঞ্জের দিকে। আশুগঞ্জে মেঘনার উপর বিরাট পুল রয়েছে। এপারে আশুগঞ্জ, ওপারে ভৈরববাজার। প্রচণ্ড গতিতে সেই পুলের দিকে এগোলো একটা বাহিনী।

ওদিকে সেদিন কুমিল্লারও পতন ঘটেছে। ওই সেকটরের সব পাক সৈন্য গিয়ে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিল।

মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা সেদিন হেলিকপ্টারে কুমিল্লা ঘুরে এলেন। ময়নামতিকে পাশ কাটিয়ে আর একটা বাহিনী

সব বাহিনীরই লক্ষ্য

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণীর ডিসেম্বর।

তখন ঢাকা

দু'দিকে দুটো মাউন্টেনগান নিয়ে
আর একটা বাহিনী লঞ্চঘাটের দিকে
দু'দল অগ্রসর হল চাঁদপুরের মুখে
অন্য কটা বাহিনীকেই লঞ্চে তোলা।
যদি প্রয়োজন হয় তবেই যাবে এই বাহিনী
নদী পথেই সাবমেরিনের ঢাকার দিকে
অগ্রসর হবে সাথে এই বাহিনীর
লঞ্চে ছিল চাঁদপুর বন্দর থেকে আসা
• সশস্ত্র নৌসৈনিক
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
তাদের সাথে আগেই
সাবমেরের কর্তারা ঠিক করে রেখেছিলেন
কখন কোথায় অপারেশন করা হবে
নিয়ে মেঘনাদিয়ার টাগবোটের সাথে
একটা বড় বাহিনীকে দু'ভাগ নিয়ে যাওয়া
ঢাকায় কখন নঙ্গরাদা করে রয়
সেই উপকূল ছোড়া থেকেই চারা যাবে সাথে
দু'তিনটে ট্রলার যন্ত্রপাতি করেছিলেন
বেশি ট্রলার এই সাথে বড় বহনের দিন যাবে
ছিল যে, তাহলে পাকিস্তানীরা ধরতো
দেখে যাবে এবং আগে থেকেই পাবে একটা
বড় প্রতিরক্ষা দুর্গে তোলা করে রাখবে।
সেইজন্যই ওখানে বড় ট্রলার করা হল
এবং ঠিক করে রাখা হল যে সবগুলো ট্রলার
টাগবোটের কাছাকাছি পৌঁছানো পর ওখানে
একটা বড় ছাউনিবাহিনীর নামানো হবে
পাকসেনাদের ওপর হামলা চালাবে যে
উত্তর দিক দিয়ে একটা বড় সেনাবাহিনী
নামানোর চেষ্টা করেছে। সেইজন্য তারা
চন্দ্রালপুরের কাছে একটা বড় ঘাঁটি
করে তোলে ছিল আর একটা ছোট ঘাঁটি
করে ১৯ নং হালুয়াঘাটের কাছে লড়াই
সুরু ৯১০নং বাহিনীকে তোলার
একটা প্রোগ্রাম চন্দ্রালপুরে
আর এক ভাগ হালুয়াঘাটের কাছে
হালুয়াঘাটের সাধারণ ছাউনি বাহিনী
প্রথমে অগ্রসর হল না। দু'চারদিন ওখানেই
অপেক্ষা করল আমালপুরে বড় লড়াই সুরু
পাক সামরিক সেনারা তাদের
হালুয়াঘাটের বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যেন
চন্দ্রালপুরের দিকে। আর মেঘনাদিয়া থেকে যে
একটা ত্রিগেড নিয়ে গেল ব্রীগেড কৈবর্তকান্দার
সেনাটেন। তারা এখন তাদেরও পারলি যে
একটা ভয়ংকর বিপদে হালুয়াঘাটের মুখে
অপেক্ষা করছে। হালুয়াঘাট থেকে চাঁদপুর
বাহিনীটা খুব দ্রুত এগিয়ে এল মেঘনাদিয়ার
দিকে সাথে বড় কোন বাধাই পেল না।
কারণ একটা পাকবাহিনী লড়াই করছে
চন্দ্রালপুরে আর একটা গিয়েছে
কৈবর্তকান্দার দিকেই সেনাটেন।

১৬ ডিসেম্বরকে

এদিকে চতুর্দিক থেকে
ঢাকার দিকে অগ্রসর হল
এখন তাদের চোখের সামনে শত্রু,
এর আগেই প্রথম লক্ষ্যটি পার
দিয়েছে।
এখন মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের নয়া
ঘাঁটিতে থাকা শেষ বাহিনীকে
দিক্ষিত করে তোলছে
শত্রুদের শেষ রক্ষা ব্যূহ
এবার ভিতরে লক্ষ্যের দিকে
চাঁদপুরে বাহিনী
ভিতরে লক্ষ্যটা হল খুব দ্রুত
এবং ঢাকার শেষ বাহিনীর আগেই
আগেই তোলা দিয়ে দিতে
বন্দী করা
সব দিক থেকেই মিত্রবাহিনী
অগ্রসর হল। শত্রুর পৌঁছে গেল
হালুয়াঘাট ময়মনসিংহে এবং চাঁদপুরে
দাঁড়িয়ে একটা বাহিনী সেনাদের
মধ্যমণি হলেন এবং একটা বাহিনী
বৃদ্ধিয়ে দ্রুত করে চলল তোলাবন্দর ঘাটের দিকে
হালুয়াঘাট থেকে এগিয়ে আসা বাহিনী
পৌঁছে গেল ময়মনসিংহের কাছাকাছি
পৌঁছাহিনীর সাথেতোলুপিও এসেছে
থেকে এগোচ্ছে ঢাকার দিকে।
এবং বিমানবাহিনীর প্রধানও শত্রুদেরই চাপে
সেদিন বিকেলে মিত্রবাহিনীর প্রধান
জেনারেল অরোরা কলকাতার এক সাংবাদিক
বৈঠকে বললেন :
আমরা এখন ঢাকার লড়াইবের প্রান্তে
সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন

পাকিস্তানীরা যদি ঘাঁটি আগলে ঢাকায় লড়াই চালাতে চায় তাহলে আপনি কী করবেন?
জেনারেল অরোরা জবাব দিলেন :
ওরা কী করবে জানি না।
তবে আমরা খোলাখুলির লড়াইয়ের জন্যই প্রস্তুত।
জেনারেল অরোরাকে সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন : ঢাকাকে মুক্ত করার পথে আপনার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী?
অরোরা বললেন : নদী।
তারপর আবার বললেন :
নদী যদিও বড় বাধা সে বাধা অতিক্রমের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। আমাদের পদাতিক সৈন্য এবং রসদ পারাপারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের পি. টি. ৬৭ ট্যাঙ্কগুলি নিজে থেকেই নদী সাঁতরে যেতে পারবে।

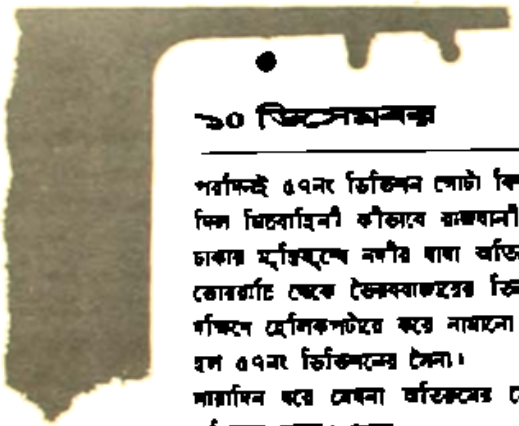

১০ ডিসেম্বর

পরদিনই ৫৭নং ডিভিশন মোটা কিস্তকে পেছনে ফেলে দিল মিত্রবাহিনী কীভাবে রাজধানী ঢাকার মুক্তিযুদ্ধে নদীর বাধা অতিক্রম করছে।
ভোরবাতি থেকে ভৈরববাজারের তিন চার মাইল দক্ষিণে হেলিকপটারে করে নামানো শুরু হল ৫৭নং ডিভিশনের সৈন্য।
সারাদিন ধরে সেতুবন্ধ অতিক্রমের সেই অভিযান চলল। প্রথম
বাহিনীটা ওপারে নেমেই ঘাঁটি গেড়ে বসল।
কিছুটা উত্তরে ভৈরববাজারের কাছেই তখন পাক সৈন্যদের একটা বড় বাহিনী মজুত।
ব্রিজটার একটা অংশ ভেঙ্গে দিয়ে নদীর পশ্চিম পারে ওত পেতে বসে আছে।
রাতদুপুর সূর্য উঠতেই তারা দেখতে পেল হেলিকপটার।
নদী পার হচ্ছে।
কিন্তু দেখেও তারা ঘাঁটি ছাড়তে সাহস পেল না। ভাবল,
এটা নিশ্চয়ই ভারতীয় বাহিনীর একটা ধাপ্পা।
ওদিকে ছুটে গেলেই আলফাস থেকে মূল ভারতীয় বাহিনীটা ভৈরববাজারের ওপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।
তারপর ভৈরববাজার-ঢাকা রাস্তা ধরবে।
সাঁতরে কিন্তু পাকবাহিনীকে ভুল বোঝাবার জন্য মিত্রবাহিনীর একটা বড় কলাম তখন এসে, তাদের দেখাচ্ছিল যে তারা আলফাস দিয়েই সেতুবন্ধ পার হবে।
পাকবাহিনী এইভাবে ভুল বোঝায় মিত্রবাহিনীর সুবিধা হল। একরকম
বিনা বাধায় সেতুবন্ধ পার হওয়া গেল।
হেলিকপটারে নদী পার হল কিছু সৈন্য।
অনেকে আবার নদী পার হল স্টীমারে এবং নৌকো করে।
কিছু পার হল স্রেফ দেশী নৌকোতেই।
ট্যাঙ্কগুলি নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু সে সমস্যাও দূর হল এক অভাবনীয় উপায়ে।
রাশিয়ান ট্যাঙ্ক সাঁতরাতে পারে ঠিকই।
কিন্তু একনাগাড়ে আধঘণ্টার বেশি সাঁতরালেই ট্যাঙ্ক ভীষণ গরম হয়ে যায়।
অথচ সেতুবন্ধ পার হতে আধঘণ্টার অনেক বেশি সময় লাগবে। তখন ঠিক হল,
ট্যাঙ্কগুলি যতটা সম্ভব নিজেই সাঁতরে এগোবে।
তারপর নৌকোতে দাঁড় বেয়ে ট্যাঙ্কগুলিকে টেনে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে।
স্থানীয় মানুষের অকুণ্ঠ সাহায্য ছাড়া এই বিরাট অভিযান কিছুতেই সার্থক হত না।
ওখানের মানুষ যে যেভাবে পারল মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করল।
শত শত নৌকা নিয়ে এল তারা।
সেইসব নৌকা বার বার সেতুবন্ধ পারাপার করল।
যেখান থেকে মিত্রবাহিনী নদী পেরিয়েছিল সেখানে কোনও রাস্তাঘাট ছিল না।
সেটা ছিল জলা জমি।
এই জলা জমি দিয়ে কামান বন্দুক ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওই এলাকার শত শত বাঙালী। বেশ কয়েক মাইল হেঁটে তারপর তারা পৌঁছেছিল ভৈরববাজার-ঢাকা মূল সড়কে। এবং পরদিনই তারা বারপুর দখল করে নিল।
ওদিকে তখন উত্তরের বাহিনীটাও দ্রুত এগিয়ে আসছে। নরসিংদীর কাছে পৌঁছে তারা দাঁড়াল। খবর ছিল যে নরসিংদীতে পাক বাহিনীর একটা ব্রিগেড রয়েছে।
কিন্তু সে ব্রিগেডটাকে যে আগেই ভৈরববাজারের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিত্রবাহিনী তা জানত না।
তাই মিত্রবাহিনী নরসিংদীতে বড় লড়াই করার জন্য সেদিনটা ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপারে সসৈন্যে অপেক্ষা করল।
অন্যদিকে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও সেদিন পাক সেনাবাহিনীকে আরও ভয় পাইয়ে দিল। বিমানবাহিনীর জলপী বিমানগুলি ঢাকা বেতার কেন্দ্রটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে এল। কুর্মিটোলার উপর বার বার রকেট আর বোমা ছুঁড়ল।
নৌবাহিনীর বিমান আক্রমণে চট্টগ্রাম এবং চালনার অবস্থাও তখন ভয়াবহ আহিল।
কয়েকটা স্টীমার ডুবি হয়ে পাকবাহিনী

হেলিকপ্টারের দিকে পালাতে গিয়েছিল।
একটা জায়গায় নিরপেক্ষ দেশের পতাকা উঁচিয়েও
কিছু পাক সৈন্য শিলাপুরের দিকে
পালাচ্ছিল। সব ধরা পড়ল। কয়েকটা পাক
বাণিজ্য জাহাজও আজ ধরিয়ার কবলে পড়ল।

১৭ ডিসেম্বর

১১ তারিখ চতুর্দিকে পাক সেনাবাহিনীর
প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। বহু
পাক ঘাঁটির পতন হল সেদিন।
মুক্ত হল জামালপুর, ময়মনসিংহ, হিলি,
গাইবান্ধা, কুলাঘাট, বাহাদুরিয়া, শিমলাডাঙা,
দুর্গাদীঘি, বিরাম এবং চণ্ডীপুর।
বিভিন্ন এলাকার শত শত পাক সৈন্য
আত্মসমর্পণ করল।
এক জামালপুরেই আত্মসমর্পণ করল ৩৮১ জন।
চাঁদপুরের উত্তরে মতলববাজারেও বহু পাক
সৈন্য আত্মসমর্পণ করল।
কিছু আবার দেহানের দিকে পালাতে গিয়ে
মার খেল। যেমন জামালপুরের বাহিনীর
একটা অংশ। জামালপুরের পাকবাহিনী যেন
কিছুদিন ধরে ভাল লড়াই-ই চালিয়েছিল।
মাটি কামড়ে তারা লড়াই চালাচ্ছিল। এই
লড়াইয়ে ভারতীয় জেনারেল সিন
মারাত্মক আহত হলেন।
কিন্তু ১১ তারিখ আর পারল না।
একটা বাহিনী আত্মসমর্পণ করল।
আর একটা টাঙ্গাইলের দিকে পালাল।
উত্তরে ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের
একটা ডিভিশন তখন ময়মনসিংহ দখল করে
নিয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে তারা সোজা
ঢাকা এগোতে পারল না।
কারণ রাস্তাটাই সোজা যায়নি। গিয়েছে
টাঙ্গাইল ঘুরে। ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার
রেললাইনটা ছিল সোজাসুজি।
কিন্তু পালাবার আগে পাকবাহিনী ব্রহ্মপুত্রের
ওপরের রেল সেতুটা ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল।
ভেঙে দিয়েছিল এই পথের আরও
কয়েকটা রেলপুল।
তাই ভারতীয় বাহিনীকে টাঙ্গাইলের পথেই
এগোতে হল। সেইটাই ওদের ছিল
তখনের পরিকল্পনা।
ওদিকে ভৈরববাজারের দিক থেকেও তখন এগিয়ে
আসছে ৪৭নং ভারতীয় ডিভিশন।
কিছুটা এগিয়েই তারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল।
একটা গেল নরসিংদির দিকে।
বিমানবাহিনীও তখন পুরোদমে আক্রমণ
চালাচ্ছে। পাকিস্তানীরা মিত্রপক্ষের
সেনাবাহিনীর হাত থেকে পালায় তো
বিমানবাহিনীর হাতে গিয়ে পড়ে।
বিমানবাহিনী সেদিন একমাত্র ঢাকাকে রেহাই
দিল। কারণ ভারত সরকার তখনই ঘোষণা
করেছিল, ওদিন ঢাকা ও করাচির উপর
আক্রমণ করা হবে না।
বিদেশীদের ঢাকা থেকে বের করে আনার জন্য
আন্তর্জাতিক বিমান হেলপ্লাওয়ে নামতে
দেওয়া হবে। এবং সেজন্য
হেলপ্লাও বিমান ধ্বংস সারাতেও দেওয়া হবে।
নৌবাহিনী কিন্তু সেদিনও ভীষণ সক্রিয়।
চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং চালনার উপর
নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিনও প্রচণ্ড
আক্রমণ চালাল।

১৮ ডিসেম্বর

পরদিনও ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার উপর
কোনও আক্রমণ করল না। সেদিন বিদেশীদের
নিয়ে ঢাকা ছেড়ে তিনখানা আন্তর্জাতিক
বিমান এল কলকাতায়। অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে
মুক্ত মানুষরা এল কলকাতায়।
বিমানবাহিনী সেদিন ধ্বংস করে ৮টিল ধ্বংস।
ভোররাতেই ছত্রী সেনারা নেমেছে টাঙ্গাইলে।
এক ব্যাটেলিয়ান ছত্রী সেনা। পূর্ব পরিকল্পনা
অনুসারেই এই ছত্রী সেনাদের নামানো হল
টাঙ্গাইলে। ময়মনসিংহের দিক থেকে
মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডটাও তখন দ্রুত এগিয়ে
আসছে টাঙ্গাইলে।
ভোররাতে ছত্রী সেনাদের নামানো হল টাঙ্গাইলে
নদীর উত্তর দিকে।
শত্রুপক্ষকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রথমে কিছু
ক্ষণের জন্য ছত্রী সেনা নামানো হল

নদীর দক্ষিণে। মীরজাপুর আর টাঙ্গাইলের মাঝামাঝি।

ভূয়া ছত্রীদের নামানো হয়েছিল প্রথম রাতে। কিন্তু পাক সেনা সেই ভূয়া ছত্রীসেনা খুঁজতে ছুটল। তারপর ভোররাতে নদীর উত্তরে নামানো হল আসল ছত্রী সেনা।

এক ব্যাটেলিয়ন- অর্থাৎ প্রায় এক হাজার। মাটিতে নামতেই তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য পেল। স্থানীয় সবাই সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল।

বিমান থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলা হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীরাই ছোটাছুটি করে তা সব সংগ্রহ করে দিল ছত্রী সেনাদের।

উত্তর দিক দিয়ে তখন জামালপুরের পাকবাহিনীর একটা অংশ পিছু হটে আসছিল।

এদের আগমনের খবর জানা ছিল না ভারতীয় বাহিনীর। কারণ, এরা প্রধানত রাতের অন্ধকারে কাঁচা রাস্তা দিয়ে আসছিল।

আচমকা এই পাকবাহিনীটা এসে পড়ল ছত্রী সেনাদের সামনে।

ওরাও আবার জানত না যে ভারতীয় ছত্রী সেনারা ওখানে নেমেছে।

ভারতীয় ছত্রী সেনারাই প্রথমে দেখতে পেল পাক বাহিনীকে। দেখতে পেয়েই দমাদম গুলি চালাল। এবং সেই আচমকা আক্রমণে পাক বাহিনী একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ল। প্রথমেই তারা ছিটকে পড়ল।

তারপর রিগ্রুপড হয়ে আবার দক্ষিণে এগোবার চেষ্টা করল।

কিন্তু ততক্ষণে ভারতীয় ছত্রী সেনারা পুরোপুরি তৈরী। লড়াই হল।

পাক সেনারা কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পরই পিছু হটার চেষ্টা করল। কিন্তু তাও পারল না।

ওদের ততক্ষণে ময়মনসিংহের দিক থেকে ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেডটাও এসে গিয়েছে পেছনে।

বাধ্য হয়ে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করল।

টাঙ্গাইলের ছত্রী সেনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট বিমান বন্দরটা দখল করে নিল।

তারপর থেকেই প্রতি দশ মিনিট অন্তর সেখানে ক্যারিবু বিমানের অবতরণ শুরু হল।

এল আরও সৈন্য। এল বহু অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধের নানা সাজসরঞ্জাম।

কয়েক ঘণ্টা পর ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেডটাও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

এবং দুই বাহিনী একত্রে এগিয়ে চলল ঢাকার পথে মীরজাপুরের দিকে।

ওদিকে এখন ৩৩নং ডিভিশনও পূব দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। সেইদিন তারা নরসিংদি অতিক্রম করে বেশ কিছুটা এগিয়েছে।

সেদিনই প্রথম ঢাকায় ভারতীয় কামানের গর্জন শোনা গেল। এবং সেই গর্জন শুনে নিয়াজি সহ ঢাকার পাক বাহিনীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

এদিকে কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ লেফটেনেন্ট জেনারেল জ্যাকবও আর এক কাণ্ড করে বসে আছেন।

সকালে সাংবাদিক বৈঠক। লেফটেনেন্ট জ্যাকব সেখানে সমূহ দুঃখ পরিস্থিতি বোঝাচ্ছিলেন।

সাংবাদিকরা তাঁকে এই ছত্রী সেনা নামানোর ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করল।

লেফটেনেন্ট জ্যাকব বললেন, হ্যাঁ ছত্রী সেনা নেমেছে। তবে কোথায় নেমেছে, কত নেমেছে আমাকে জিজ্ঞেস করো না।

বিদেশী সাংবাদিকরা এই ব্যাপারে যত প্রশ্ন করেন, লেফটেনেন্ট জ্যাকব ততই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

তারই মধ্যে তিনি ইংগিতে এমন একটা বাক্য দিলেন যে এক ব্রিগেডের বেশি ছত্রী সেনা নামানো হয়েছে এবং ঢাকার কাছাকাছি বিভিন্ন এলাকায় তারা নেমেছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি এই খবর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে ছড়িয়ে দিল।

খবরটা ঢাকায়ও গিয়ে পৌঁছল। এবং পাক সমরনায়করা সেই খবর পেয়ে বিষম ভয় পেয়ে গেল।

তারা ভাবল, হয়ত ঢাকার চতুর্দিকেই মিত্রবাহিনী

বন্ধুরা মুক্তির বার্তা কও?
বিমানপথে হয়ত এসেছে?

শত্রুর ছত্রী সেনা নামিয়েছে। এবং, হয়ত সব
খবর তারা তখনও পায়নি।
ঢাকার সবাই বুঝল, এবার আর রক্ষা নেই।
জেনারেল মনেকশর আবেদনও তখন
বার বার প্রচারিত হচ্ছে:
বাঁচতে চান তো আত্মসমর্পণ করুন।
পালাবার কোনও পথ নেই।
লড়াই করা বৃথা।
আত্মসমর্পণ করলে সব পাক সেনা
জেনিভা কনভেনশন অনুসারে ব্যবহার পাবেন।

৯৩ ডিভিসনদের

মিত্র সেনাবাহিনী যতই ঢাকার দিকে
এগিয়ে আসছিল এবং ঢাকার উপর বিমান হানা
যতই বাড়ছিল ঢাকার পাক সামরিক
নেতাদের অবস্থাও ততই কাহিল হয়ে উঠছিল।
সাধারণত বিপদে পড়লে জেনারেলরা যা করে
প্রথম প্রথম এরাও তাই করল--
ইসলামাবাদের কাছে বার বার আরও সাহায্য
পাঠাবার আবেদন জানাল।
বলল: ভারত অন্তত ৯ ডিভিসন সৈন্য এবং
দশ স্কোয়াড্রন বিমানী নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে।
সুতরাং আমাদেরও অবিলম্বে আরও
কয়েক ডিভিসন সৈন্য এবং কয়েক স্কোয়াড্রন
বিমান চাই।

ইসলামাবাদ প্রত্যুত্তরে ঢাকার কর্তাদের বলেছিল :
তোমরা মাত্র কয়েকটা দিন লড়াইটা
চালিয়ে যাও। আমরা দিন সাতেকের মধ্যেই
পশ্চিমখণ্ডে ভারতীয় বাহিনীকে এমন মার
দেব যে তারা নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে
বাধ্য হবে। এবং তখন যুদ্ধই থেমে যাবে।
সুতরাং
তোমাদেরও আর কোনও অসুবিধা থাকবে না।
কিন্তু দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যেই ঢাকার পাক কর্তারা
বুঝতে পারল,
ওদিকেও যোল সুবিধা হচ্ছে না।
তাদের নতজানু হওয়ারও কোনও-ই সম্ভাবনা
দেখা যাচ্ছে না।
বরং ভারতীয় বাহিনী প্রচণ্ড বেগে ঢাকার
দিকে এগোচ্ছে।
তখন তারা অনেকেই ভয় পেয়ে গেল।
চর পেল প্রধানত দুটো কারণে।
প্রথম কারণ, পালাবার পথ নেই। কোথাও যে
পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে
তার উপায় নেই।

বিমান বন্দরে পালাবার মত কোনও পাক-বিমান নেই। মাথার উপরে ভারতীয় বিমান। সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবরোধ। স্থলপথে যেদিকেই যাওয়া যাবে, ভারতীয় সেনা। মুক্তিবাহিনী বা আমার মানুষের হাতে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

তাদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের মানুষ
কতটা ক্ষেপে আছে সেটা
তাদের জানতে তখন বাকি নেই।
তাই মিত্রবাহিনী পদ্মা এবং মেঘনার কূলে
এসে দাঁড়ানো মাত্রই ঢাকার পাক কর্তাদের
মনোবল ভেঙ্গে পড়ছিল। তারা অসহায়
বোধ করতে শুরু করেছিল। এর উপর যখন
তারা দেখল যে বিজিত অঞ্চলে ছড়ানো পাক-
বাহিনীও আর ঢাকার দিকে ফিরতে
পারছে না তখন তারা অনেকে একেবারে
হাত-পা ছেড়ে দিল।
ঢাকার পাক সামরিক কর্তাদের মধ্যে দোড়া
ছেকেই দুটো ভাগ ছিল। একটা অধিনায়ক
নিয়াজির সমর্থক। আর একটা লেফটেনান্টের
সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল রাও
ফরমান আলির সমর্থক। এরা দুজনে
দুরকমের লোক ছিল।
দুজনেই প্রায় সমান বাঙালী বিদ্বেষী

দুজনেই ঘোড়া থেকে বিশ্বাস করত,
পিটিয়েই বাঙালীদের শায়েস্তা করা যাবে।

মিয়াজি মহান এবং লম্পট। করমান আলি মদ্যপায়ী এবং শয়তান। মিয়াজি বেলেল্লাপনা করে সময় কাটাত। আর করমান তার দপ্তরে বসে ঘাটি কষত।

মানবধর্ম নিয়ে নগ্নতম অত্যাচার চালাবার নীতিতে বিশ্বাস করত।
ঘোড়া থেকেই এরা একে অপরকে সহ্য করতে পারত না। যুদ্ধ শুরু হতেই মতবিরোধটা তীক্ষ্ণ ভাবে বাড়ল। রাও ফরমান বলল, নিয়াজির প্রোটা প্ল্যানিংটাই ভুল, তাই এই বিপর্যয়।
নিয়াজি বলল, আমাকে ইসলামাবাদ যেমন বলেছে আমি তেমন করেছি—অর্থ বিলাস ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আমার তোমার।
ফরমান আলি ঘোরতর নিয়াজি-বিরোধী হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তার তেমন কিছুই করার ছিল না। কারণ নিয়াজি পদ মর্যাদায় এর চেয়ে ওপরে—সে মেজর জেনারেল, আর নিয়াজি লেফটেনেন্ট জেনারেল। তাই রাও ফরমান নিয়াজির বিরুদ্ধে যা করার করত কৌশলে—অন্তরের আড়ালে।
যুদ্ধ তিন চার দিন চলতেই ফরমান আলি নিয়াজির বিরুদ্ধে একটা বেশ ভাল মত ব্যবস্থা নিল। সে স্থির করল পূর্বপাকিস্তান সরকারের পাঞ্জাবী চিফ সেক্রেটারি মুজাফফর হুসেনকে। বলল: মাতাল নিয়াজিটা নিজেকে বড় করে দেখাবার জন্য ইসলামাবাদে যুদ্ধের সব ভুল খবর পাঠাচ্ছে। আমাদের অবস্থা যে শোচনীয় সেটা সে প্রেসিডেন্টকে জানাচ্ছেই না। আমাদের সেনাবাহিনী যে মার খেয়ে আমরা হয়ে গিয়েছে সে খবরও ইসলামাবাদ পায়নি। অথচ বাস্তব পরিস্থিতিটা ইসলামাবাদের জানা উচিত। আমার অনুরোধ, আপনি সঠিক পরিস্থিতিটা প্রেসিডেন্টকে জানান। আমিই জানাতাম। কিন্তু সাংবিধানিক রীতি অনুসারে আমি তা পারি না। আমি নিয়াজির সাব অর্ডিনেট। সাব অর্ডিনেট কখনও সুপারিয়রের রিপোর্টের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠাতে পারে না।
ফরমানের প্রস্তাবটা তার ভালই মনে হল। তাই চিফ সেক্রেটারি নিজেই বিস্তারিত জানিয়ে প্রেসিডেন্টকে একটা জরুরী বার্তা পাঠাল।
ইয়াহিয়া নিজেই তখন তীক্ষ্ণ বিপদ্ন।

ঢাকা থেকে হুসেনের এই বার্তা
পেয়ে ইয়াহিয়া তাই রীতিমত ঘাবড়ে গেল।
সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার লড়াই পরিচালনার জন্য চারজনকে নিয়ে একটা কমিটি করে দিল। বলল: দূরের পূর্ববাংলা থেকে এখন নিয়মিত খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে পূর্ববাংলার যুদ্ধ সম্পর্কে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তাই, এই কমিটি করে দেওয়া হল। এই কমিটিই পূর্ববাংলার যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবে।
প্রেসিডেন্ট এই কমিটির সদস্য করল চারজনকে: গভর্নর মালিক, নিয়াজি, চিফ সেক্রেটারি এবং রাও ফরমান আলি।
এই কমিটি গঠনের নির্দেশটা যখন ঢাকায় এসে পৌঁছল তখন বাংলাদেশে পাক ফৌজের অবস্থা আরও খারাপ।
চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে পরামর্শ করে ফরমান আলি সেই চারজনের কমিটির সামনে এমন একটা প্রস্তাব আনল যাকে ঠিক পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ বলা না গেলেও কার্যত সেটা শর্তাধীন আত্মসমর্পণই।
নিয়াজি কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধী।
গভর্নর মালিক মোটামুটি নিরপেক্ষ থাকল।
চিফ সেক্রেটারি ফরমান আলির প্রস্তাবটা খুব জোরে সমর্থন করল।
এটা ১ ডিসেম্বরের ঘটনা।
নিয়াজির আপত্তিও ফরমান আলি তেমন আমল না। কারণ, পাক সেনাবাহিনীর অফিসারদের একটা বেশ বড় অংশও তখন তার সমর্থক। তাদেরও প্রাণে ভয় ঢুকে গিয়েছে।
ফরমান একটা খসড়া প্রস্তাব তৈরী করল। এবং সেই প্রস্তাব নিয়ে ঢাকার মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গেও কথা বলল। আর কথা বলল ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের তাদ টিমের প্রধান পল হেনরির সঙ্গে।
ফরমান আলি তাদের সবাইকে জানাল যে এই সিদ্ধান্ত ওই চারজনের কমিটি দ্বারা অনুমোদিত।
একমাত্র মার্কিনী রাষ্ট্রদূত ছাড়া আর সবাই এতে সম্মতি জানাল।
মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলল,
যে আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে নিয়াজির সম্মতি নেই, যে প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অনুমোদিত নয় সে প্রস্তাবের মূল্য কী?
অন্যরা সবাই বলল, না, এ প্রস্তাবটা ভালই।
ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিংইনেনটাল হেডটেলে সমবেত বিদেশীরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরাও প্রস্তাবে সমর্থন জানাল।

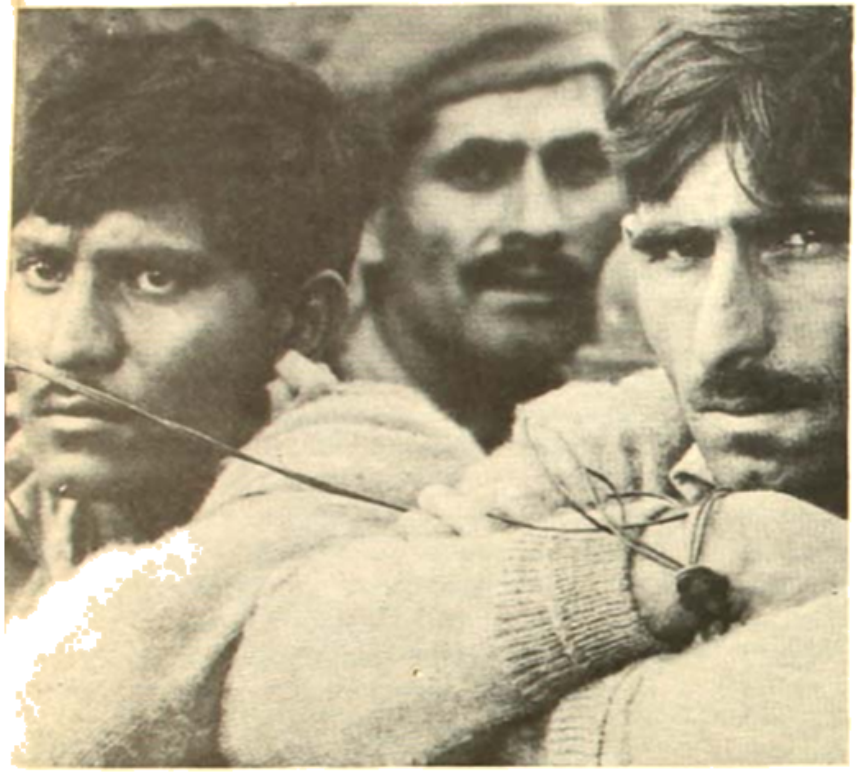

শিবালয় সেই রব যাওক।
এরই বলেছিল—
বাংলাদেশ ইজ ডিফিকাল্ট'
মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যাকটিভেটেড বলীদল
হবে। এরই ব যার ধরে পড়ের
সেই বাংলাদেশের
জনগণের জনগণের লাইন দিয়ে
পশ্চিম পাকিস্তানে ধরিয়ে দিয়ে
ছাড়ল, আসলল যারা এর
পাকিস্তানের পাশ থাকে তারা দিয়েছে।

পশ্চিমে সেদিন ৪নং ডিভিশনও মধুমতী
পার হয়ে পৌঁছে গিয়েছে পদ্মার তীরে।
উত্তর এবং পূর্ব দিক থেকে
মিত্রবাহিনীর কামানের গোলাও পড়া শুরু হয়েছে
কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে।
এবং বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলিও
বার বার হানা দিচ্ছে ঢাকার সব কটা
সামরিক ঘাঁটির উপর।
পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য
মিত্রপক্ষ সেদিন সর্বতোভাবে সচেষ্ট।
একদিকে চলছে কামানে-বিমানে তীব্র আক্রমণ,
আর একদিকে বেতারে প্রচারিত হচ্ছে
আত্মসমর্পণের আবেদন।
জেনারেল মানেকশর বাণী সেদিন প্রচারিত হল
রাও ফরমান আলির উদ্দেশে।
জেনারেল মানেকশ বললেন ঃ
আমার সৈনারা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং
ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে।
সুতরাং, আপনারা আত্মসমর্পণ করুন।
আত্মসমর্পণ না করলে নিশ্চিত মৃত্যু।
যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা
করা হবে এবং তাদের প্রতি
ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেদিন শত শত
পাক সেনা আত্মসমর্পণ করল।
এক ময়মনসিংহেই আত্মসমর্পণ করল
১১০৪ জন।
কিন্তু তখনও নিয়াজি অবিচল।
তখনও সে লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।
এবং তখনও তার সঙ্গে একমত হয়ে
প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে
খুলনা, বগুড়া এবং চট্টগ্রামের পাক অধিনায়করা।

১৪ ডিসেম্বরঃ

নিয়াজি তখনও মৌ ধরে বসে আছে, কিন্তু
আর প্রায় সকলেরই হৃৎকম্প উঠে গিয়েছে।
১০ তারিখ রাত থেকে ১৪ তারিখ ভোর পর্যন্ত
পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে মিত্রবাহিনীর
কামান অবিরাম গোলা ছেড়ে চলল।
গোলাগুলি পড়ল গিয়ে প্রধানত
ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। কিন্তু সে গোলার
আওয়াজে সারারাত ধরে গোটা ঢাকা কাঁপল।
ঢাকার সবাই সেদিন জীবন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।
বুঝল, আর রক্ষা নেই।
গভর্নর মালিক সেদিন সকালেই
"সমস্ত পরিস্থিতি" বিবেচনার জন্য
গভর্নর হাউসে মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক
ডাকল। এই বৈঠক বসাবার ব্যাপারেও
ফরমান আলি এবং চীফ সেক্রেটারি
মুজফ্ফর হুসেনের হাত ছিল।
তারা তখনও মনে করছে,
আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই, রক্ষা নেই।
মন্ত্রিসভার বৈঠক বসল বেলা এগারোটা নাগাদ।
এবং একটা পাকিস্তানী ওয়ারলেস মেসেজ
ধরে মিত্রবাহিনীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই
জেনে ফেল সেই বৈঠকের খবরটা। সঙ্গে সঙ্গে
সংবাদ চলে গেল ভারতীয় বিমানবাহিনীর
পূর্বাঞ্চলীয় হেড কোয়ার্টারে।
এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক ঝাঁক
ভারতীয় জঙ্গী বিমান উড়ে এল
ঢাকার গভর্নর হাউসের উপর।
একেবারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তারা ছুঁড়ল রকেট।
গোটা পাঁচেক গিয়ে পড়ল একেবারে
গভর্নর হাউসের ছাদের উপর।
মিটিং তখনও চলছিল।
মালিক এবং তার মন্ত্রীরা ভয়ে প্রায় কেঁদে
উঠল। চীফ সেক্রেটারি, আই. জি. পুলিস প্রভৃতি
বড় বড় অফিসাররাও মিটিং-এ উপস্থিত

ছিল। তারাও চরে যে যেমন পারল পালাল।
বিমান হানা শেষ হওয়ার পর মালিক সাহেব
তার পার্ষদ-শিষ্যদের সঙ্গে আবার বসলেন।
এবং তারপর আর পাঁচ মিনিটও
লাগল না তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।
তারা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন। প্রস্তাব
সবাই সমর্থন করলাম।
সেই সমর্থনের সিদ্ধান্ত তারা সঙ্গে সঙ্গে
ঢাকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির
প্রতিনিধি রেনড সাহেবকে জানাল এবং এর
জন্যে আশ্রয় চাইল।
রেনড সাহেব তখন ইনটারকন্টিনেন্টাল হোটেলকে
রেডক্রসের অধীনে "নিরপেক্ষ এলাকা"
করে নিয়েছেন। এই "নিরপেক্ষ এলাকা" তখন
ঢাকার একটা অদ্ভুত জিনিস। গোটা ঢাকা
তখনও পাকিস্তানীদের দখলে, শুধু এই
হোটেলটা ছাড়া! হোটেলটার উপরে
রেডক্রসের বিরাট বিরাট পতাকা উড়ছিল। বহু
বিদেশী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আশ্রয়
নিয়েছিল ওই হোটেলে। ১৪ তারিখ সেখানে
সদলবলে গিয়ে আশ্রয় নিল মালিক সাহেব।
তখন ঢাকার সবাই মনে করছে ওটাই একমাত্র
নিরাপদ আশ্রয়—ভারতীয় বৈমানিকরা
কিছুতেই রেডক্রসের বড় বড় পতাকা ওঁকা
বাড়িতে আক্রমণ করবে না।
রেনড সাহেব তার এলাকায় ওদের আশ্রয়
দিয়েছে খবর পাঠালেন জেনিভায়।
সেই বার্তায় বলা হল :
পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ অফিসাররা
সপরিবারে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক অঞ্চলে আশ্রয় চেয়েছেন।
জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী তাদের আশ্রয় দেওয়া
হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে
যেন অবিলম্বে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়।
খবরটা যেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে
জানানো হয়।
মালিক এবং তার গোটা
"পূর্ব পাকিস্তান সরকারের" এই সিদ্ধান্তের
সব নিরাপত্তার অবস্থা আরও কাহিল হল।
ঢাকার উপর তখন প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে।
আক্রমণ চলছে কামানের।
আক্রমণ চলছে বিমানের। প্রধান লক্ষ্য
কুর্মিটোলা ক্যানটনমেন্ট। নগরবাহিনী
তখন টঙ্গীর কাছে পৌঁছে গিয়েছে।
এবং পাক সেনারা শীতলক্ষা নদীর একটা শাখার
উপরের ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়ে ওপার থেকে
তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।
মূল পাকবাহিনীটা কিন্তু কামান এবং বিমান
আক্রমণের প্রায় নাগাল হবে দিয়ে কুর্মিটোলা
ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয়

১৬ ডিসেম্বর। শুক্রবার। ১৯৭১।
বেলা ১০টা ৪০ মিনিট। ভারতীয়
বিমানগুলোর চোখে ভাসছিল ঢাকার
চত্বরগুলো।

একটি রুশী ট্রলার।
১৭ ডিসেম্বর করাচি বন্দরে ট্রলারটি দেখতে
ভিড় করেছিলেন। ভবতোষ দত্ত এবং নলাক্ষ
ছবিটি নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

নিয়েছে। পূর্বদিকের বাহিনীটিও প্রায়
পৌঁছে গিয়েছে ডেমরায়।
এবং নিয়াজি তখনও বলছে :
শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব।
নিয়াজি অবশ্য একথাটা বলছিল প্রধানত
মার্কিনীদের ভরসায়। মার্কিনী সপ্তম নৌবহর
যে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে একথা
চার পাঁচ দিন আগে থেকেই জানা গিয়েছিল।
গোটা দুনিয়ায় তখন সপ্তম নৌবহরের
বঙ্গোপসাগরে আগমন নিয়ে জোর
জল্পনা-কল্পনা চলছে।
মার্কিন সরকার যদিও ঘোষণা করলেন যে কিছু
আমেরিকান নাগরিককে অবশ্যই বাংলাদেশ
থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই
সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে।
আসলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না।
সকলেরই মনে তখন বেজায় সন্দেহ।
সকলেরই মনে তখন প্রশ্ন, প্রেসিডেন্ট নিকসন
কি ইয়াহিয়ার রক্ষার্থে
মার্কিন নৌবহরকে আসরে নামাবেন?
ঠিক কী উদ্দেশ্যে মার্কিন সপ্তম নৌবহর
বঙ্গোপসাগরে এগোচ্ছিল এবং কেনই বা
তারা কিছু না করে (বা করতে না পেরে)
ফিরে গেল সে রহস্যের এখনও সম্পূর্ণ
কিনারা হয়নি। তবে ইতিমধ্যেই ঢাকার এইটুকু
জানা গিয়েছে যে ইসলামাবাদের খবর মত

১৪ ডিসেম্বর নিয়াজি আশা করেছিল যে
সপ্তম নৌবাহিনীর রণী বিমানগুলি
তার সাহায্যে আসরে নামবে।
ইয়াহিয়া নিজে নাকি নিয়াজিকে সে খবর
জানিয়েছিল।
সেই ভরসাতেই ১৪ তারিখেও নিয়াজি বলে চলেছে :
একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাব।
ওদিকে মিত্রবাহিনী তখন প্রচণ্ডভাবে ঢাকার
সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর আক্রমণ
চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখনও তারা
ঠিক জানে না যে ঢাকার ভেতরের অবস্থাটা কী।
অর্থাৎ, পাকবাহিনী কীভাবে ঢাকার লড়াই
লড়তে চায় এবং ঢাকার ভেতরে শক্তিই বা
কতটা। সে খবর মিত্রবাহিনী
জানে না। নানাভাবে এই খবর সংগ্রহের চেষ্টা
চলল। কিন্তু আসল খবরটা কিছুতেই পাওয়া
গেল না। যা পাওয়া গেল সব ভুল।
সেই ভুল খবরগুলির একটা :
পাকিস্তানীরা গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে
পরিখা খনন করে হাউস টু হাউস লড়াইয়ের
জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।
আর একটা খবর : ঢাকায় পাকবাহিনীর অন্তত
দেড় ডিভিশন সৈন্য রয়েছে।
এবং রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র।
এই খবর দুটোই ভুল ছিল। কিন্তু তখনকার মত
এই খবর দুটোই ঠিক মনে হয়েছিল

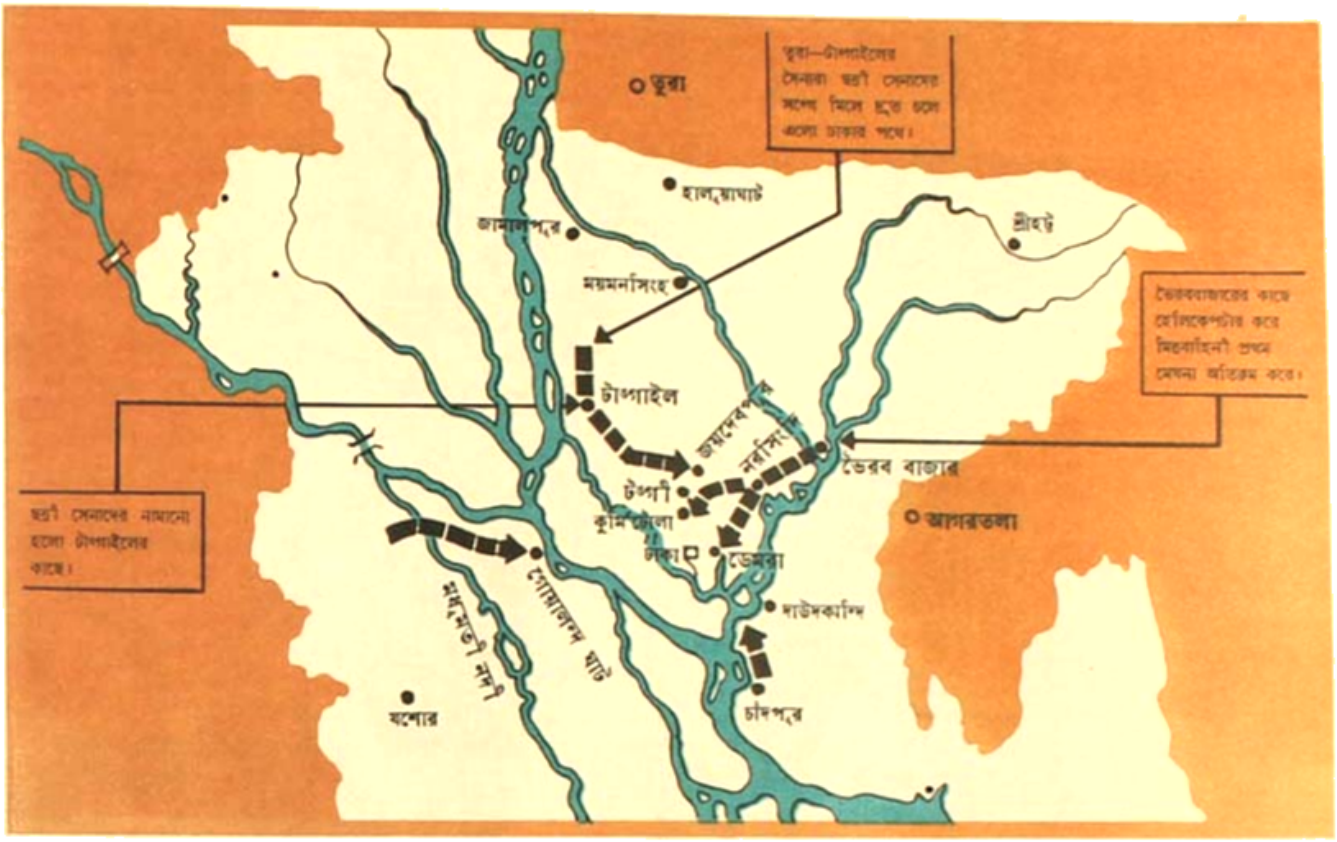

মিত্রবাহিনী এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ঠিক করল যে ঢাকার ভেতরে লড়াই করার জন্য বাঁধ সৈন্যদের এগিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ বিমান আক্রমণ চালানো হয় তাহলে লড়াইয়ে প্রচুর সাধারণ মানুষও মারা যাবে। মিত্রবাহিনী এইটা কিছুতেই করতে চাইছিল না। তাই, ওইদিনই তারা একদিকে যেমন আবার পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন জানাল এবং তেমনি আর একদিকে ঢাকার সাধারণ নাগরিকদের অনুরোধ জানাল, আপনারা শহর ছেড়ে চলে যান। যত তাড়াতাড়ি পারেন ঢাকা শহর খালি করুন। উত্তর এবং পূর্ব—রাজধানীর দুদিকেই তখন আরও বহু মিত্রসেনা এসে উপস্থিত হয়েছে। চাঁদপুরেও আর একটা বাহিনী তৈরী হচ্ছে নদীপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য।

১৫ ডিসেম্বর

আগেই বলা হয়েছে, নিয়াজি মার্কিন সপ্তম নৌবহরের সাহায্য আশা করছিল। এবং, সেই ভরসায়ই দিন গুনছিল। কিন্তু ১০ বা ১৪ তারিখ কোনও একটা সময়ে নিয়াজি বুঝল, না, মার্কিন সপ্তম নৌবহর ঢাকে সাহায্য করতে আসবে না। এই জিনিসটা ঠিক কখন এবং কীভাবে নিয়াজি জানল সেটা বলা মুস্কিল। এখনও সে তথ্য প্রকাশিত হয়নি। ভবিষ্যতে হয়ত কোনও দিন জানা যাবে এবং তখন বোঝা যাবে আসল ব্যাপারটা।

তবে, ইতিহাসেই যতটা জানা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৪ ডিসেম্বর সকাল থেকেই নিয়াজি সব আশা ছেড়ে দিয়েছে।

ওইদিনই সে শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল। বিশেষত, মার্কিনীদের সঙ্গে।

ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্মীরা সেই প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দিলেন দিল্লির মার্কিন দূতাবাসে। তাঁরা আবার খবরটা পাঠালেন ওয়াশিংটনে।

তখন ওয়াশিংটন ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসের কাছে জানতে চাইল, নিয়াজির প্রস্তাবে ইয়াহিয়ার সমর্থন আছে কিনা? ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস বহু চেষ্টা করেও সেদিন ইয়াহিয়াকে ধরতেই পারল না। নিয়াজির ১৪ তারিখের প্রস্তাবও কার্যত তখনকার আগের ১০ তারিখের প্রস্তাবেরই

নেই

কতকগুলি বিদেশী সংবাদপত্র
কিন্তু এই সময় নিরপেক্ষতে আন্তর্জাতিকতার
পরিচয় দিয়েছিলো। এছাড়া বোলশেভিকদের
কাছ থেকে ক্রেমলিনের এবং তাদের বিরোধী
সোশিয়ালিস্টদের চাপ ছিল যে ব্রেস্ত-লিতভস্কের
বিরোধিতায় মুখোমুখি
এই কারণে তার চারিদিকে নিরপেক্ষ কোনও
সংবাদ করতে সাহসে এবং শুধু লোক তার
কাছে তাদের কাছ থেকে এবং সোশিয়ালিস্টদের
সাথেও যুক্তিছিল,
যদি সে ব্রেস্তলিতভস্কে
বিরোধিতার চাপে নতুনভাবে
চারিদিক বিচারে অগ্রসর হ
অবশ্যে সোভিয়েত তাদের অবস্থানের কাছ
থেকে যে ব্রেস্তলিতভস্কে করতে চায়,
এবং কতকগুলি কারণের প্রধান
কারণের সোশিয়ালিস্টদের অবস্থানে
তাদের সাথেদের সংযোগ এবং এবং তাদের
যোগাযোগ করা চলবে না
অবশেষে এই প্রস্তাবের সাথে সাথেই

১৬ ডিসেম্বর

পিটুনেরা অবে হাত বাঁধা ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনের ইকে তোলা হচ্ছে। পরনে তার নিজেরই অবের ঢিলেঢালা এবং—জাঙিয়া। ঠিকমত হাত তোলে নবর তোলেছেন জনতার ওপরান।

বাংলা খবরে জানতে পারলেন, নিয়াজি কোনও জবাবই দেননি! বিমান আক্রমণ বিরতির সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে! ঠিক তখনই নিয়াজি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে। জানিয়েও দিয়েছে যে তার বাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করবে।

তখনই ঠিক হল, বেলা বারোটা নাগাদ মিত্রবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল জ্যাকব ঢাকা যাবেন নিয়াজির সঙ্গে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা পাকা করতে।

ওদিকে তখন জেনারেল নাগরার বাহিনীও প্রায় মীরপুরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডের ওপর নাগরার বাহিনী আটকে পড়েছিল। টাঙ্গির কাছাকাছি। নদীর ওপরের ব্রিজটা পাকিস্তানীরা ভেঙে দিয়েছিল।

১৬ তারিখ ভোরে নাগরার বাহিনী নারায়ণগঞ্জ ফেরেন্ট রোড দিয়ে সাভারের কাছাকাছি এসে ঢাকা-আরিচাঘাট রোডের উপর পড়ল। পাকবাহিনী এই রাস্তায় ভারতীয় বাহিনীকে বাধাই করেনি। তাঁরা ওদিকে কোনও প্রতিরোধের ব্যবস্থাই রাখেনি। এমন কি, ব্রিজগুলি পর্যন্ত ভাঙেনি। আরিচাঘাট রোডে পড়ে গন্ধর্ব নাগরার বাহিনী সোজা ঢাকার দিকে এগোলো। মাত্র কয়েক মাইল।

শুক্রবারেই মীরপুরে। পাকবাহিনীর জেনারেল জামশেদ সেখানে গিয়ে নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করল। নাগরার বাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যেই জেনারেল জ্যাকব হেলিকপ্টারে ঢাকা পৌঁছলেন। নিয়াজির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হল। আত্মসমর্পণের দলিলও তৈরী হল। বিকাল ৪টা নাগাদ সদলবলে ঢাকা পৌঁছলেন মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা। ৪-২১ মিনিটে ঢাকার রেস কোর্সে জনতার "জয় বাংলা" ধ্বনির মধ্যে নিয়াজি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা পাকবাহিনীর কাছে তৎক্ষণে আত্মসমর্পণের নির্দেশ চলে গিয়েছে।

সেদিন লড়াই চলছিল শুধু চট্টগ্রাম এবং খুলনায়। পাক নবম ডিভিশনের প্রধান ওইদিন সকালে নিজে থেকেই আত্মসমর্পণ করেছিল। মধুমতী নদীর পূর্ব তীরে। চট্টগ্রাম শহরেও ভারতীয় সৈন্য তখন প্রায় ঢুকে পড়েছে। আর খুলনার পাকবাহিনীর একটা অংশ তখন ঝালিসপুরের অবাঙালী জনবসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর সব যুদ্ধই থেমে গেল। ১৬ ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশ মুক্ত এবং স্বাধীন।

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

Jagjit Singh

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

AAK Niazi Lt Gen

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

'আমি অস্ত্র ত্যাগ করে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' বৃহস্পতিবার ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় লে. জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে সই করছেন। পাশে বিজয়ী বীর লেফটেনান্ট জেনারেল অরোরা।

সে কী জয়ধ্বনি! সে কী আনন্দ!
সূর্য তখন সবে অস্ত গিয়েছে। হেড লাইট জ্বেলে ঢাকা শহরে ঢুকছে মিত্র বাহিনীর একটার পর একটা কনভয়। সব গাড়ি চলেছে কুর্মিটোলা ক্যানটনমেন্টের দিকে। কিন্তু বাধাহীন ভাবে এগোবার কোনও উপায় নেই। পথে পথে আনন্দে পাগল মানুষ গাড়ি আটকে থামিয়ে মিত্র বাহিনীর সেনাদের জড়িয়ে ধরছেন। জানাচ্ছেন তাঁদের প্রাণের ভালবাসা এবং চিরজীবনের কৃতজ্ঞতা।
সমস্ত বাংলাদেশ, সমস্ত ঢাকা সেদিন আনন্দে পাগল।
ঢাকার সেই বিখ্যাত ইনটারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। ওপরে উড়ছে রেডক্রসের বড় বড় পতাকা। ভেতরে আশ্রিত মানুষের ভিড়। আশ্রিতদের মধ্যে রয়েছেন পলাতকা গভর্নর মালিকও। রয়েছেন আরও বহু বিদেশী এবং পাকিস্তানী। এতদিন পাকিস্তানীরাই ছিলেন সেখানে প্রভু, বাঙালীরা দাস। গোটা বাংলাদেশে পাক শাসনে এইটাই ছিল রেওয়াজ।
১৬ ডিসেম্বর থেকে ব্যবস্থাটা একেবারে পাল্টে গেল। বাংলাদেশে বাঙালীরা স্বাধীন, মুক্ত—পাকিস্তানীরা বন্দী।
কথা হচ্ছে হোটেলের সব আলোগুলি জ্বেলে দিলেন বাঙালী কর্মীরা।
সব বাঙালী কর্মীরা ছুটে এলেন সেই ভারতীয় সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। তাঁদের ঘিরে ধরলেন তাঁরা। তাঁদের ঘিরে এলেন বিদেশী বন্ধু দূতের মাঝখানে। ঘোষণা করলেন সব বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে করে: আজ আমরা স্বাধীন।
এই স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ভারতীয় বন্ধুদের। শ্লোগান দিলেন "স্বাধীন বাংলা জিন্দাবাদ"
"শেখ মুজিব জিন্দাবাদ"
"ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ"।
এগিয়ে এলেন হোটেলের সবচেয়ে মাননীয় ব্যক্তি। একটা সাম্পেনের বোতল হাতে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন: জেনটেলমেন, আসুন আজ আমরা স্বাধীন বাংলার জন্মোৎসব পালন করি। আসুন আজ আমরা আনন্দ করি।
তিনদিন আগেও ওই ভদ্রলোক নিয়াজির সঙ্গে হুইস্কির বোতল খুলতেন।
পাকিস্তানের দীর্ঘজীবন কামনা করে গেলাস তুলতেন।
ইনটারকন্টিনেন্টাল হোটেলে যখন স্বাধীন বাংলার উৎসব চলছে নিয়াজিরা তখন কুর্মিটোলায় ঘিরে রয়েছেন জেনারেল সগৎ সিং।

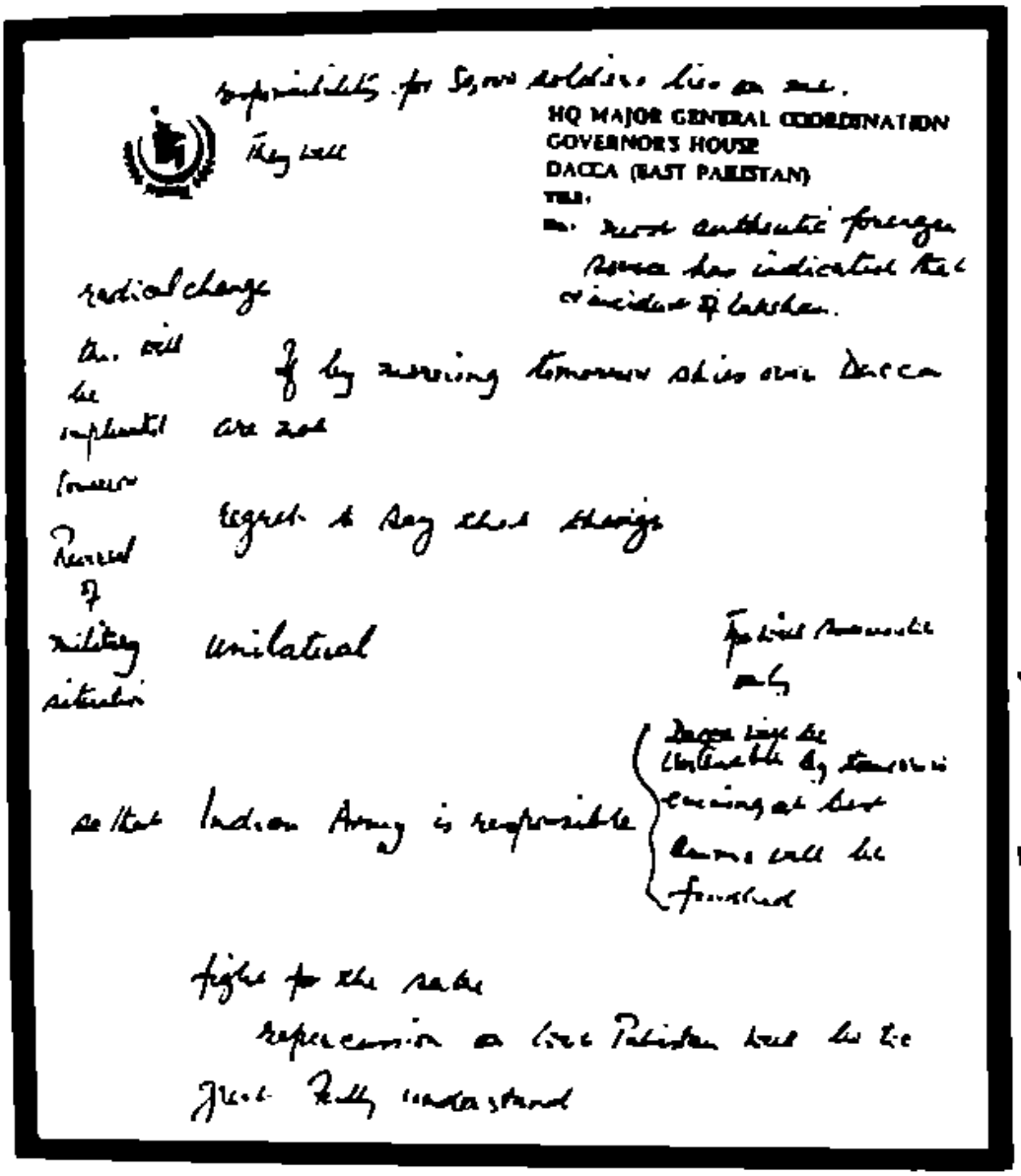

responsibility for Pak soldiers lives as well.

HQ MAJOR GENERAL COORDINATION
GOVERNOR'S HOUSE
DACCA (EAST PAKISTAN)

Very well

Ref: Most authentic foreign news has indicated that evacuation of families.

radical change

Dr. will be replaced are not known

If by morning tomorrow also over Dacca

Regret to say that things

Period of military situation

Unilateral

Political necessity only

Dacca may be declared by tomorrow evening at last Dacca will be formed

so that Indian Army is responsible

fight for the sake

representation as true Pakistan must be the

first fully understood

ঢাকা ডুবে যাবার ঠিক আগে সন্তানের বাঁচানোর পাঞ্জাবি মায়ের ছেলেকে ফেলে আসা সরকারী স্কুল নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। ডিজিটাল অ্যালবাম চিত্রের কয়েকটি টুকরো —রেসপন্সিবিলিটি ফর ডিফেন্স সোলজারস লাইফ এস উ, যে উইল, মোস্ট অথেনটিক ফরেন নেসেস হ্যাভ ইনডিকেটেড দ্যাট, আলজ ইনসিডেন্ট অব লাকনাস, হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা উইল বি ইনডিসেন্টেড টুমরো, ডিফেন্সলেস অব সিভিলিয়ান পিপলস ইজ দ্যাট মর্নিং টুমরো স্কাইজ ওভার ঢাকা আর নট, সিনসেই টু দে আই থিংক, ইউনিলেটারেল ফোর্স উইল বি অ্যাবটমেন্ট টুমরো ইভনিং আই থিংক,... উইল বি ডিসিসিভ, দে আই ইনডিকেশন আর্মির ইজ রেসপনসিবল, আই অ্যম দ্য কেস, ডিফারেন্সেস ইন এফেক্ট পাকিস্তান উইল বি টু দেম, ফুলস আনডারস্টান্ড.....।

বোধি-বিলোপের চক্রান্ত

পাঞ্জাবী সোলজাররা মার্চ-এপ্রিলে সবাইকে ছেকে তুলতে পারেনি। চিনে চিনে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ধরার সূক্ষ্ম সবচেয়ে বড় হ্যান্ডিক্যাপ ছিল তাদের। নাম মুস্তিবর রহমান, শুধু এই অপরাধে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় বেল ক'জনের মৃত্যু হলো। বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা নামের মিল থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী বুদ্ধিসুলভমানেরও পাঞ্জাবী সোলজারের বুলেট খেতে হল। তখন বাঙালী বিশ্বেষী এই অন্ধদের আলো দিতে বাঙালীরাই এগিয়ে এল। জামাত ইসলামের স্টুডেন্ট উইং ইসলামী ছাত্র সংঘ। সংঘের গড়ইলের সশস্ত্রবাহিনী -আল বদর বিশিষ্ট বাঙালীদের চিহ্নিত করার, ধরিয়ে দেবার- অবশেষে কোতল করার ভার নিল। গেস্টাপো স্টাইলের এই বাহিনীটির জন্যে দুহাতে টাকা খরচ হত। ঝকঝকে ছাপা অসংখ্য পামফ্লেট ছেপে বেরোতো। তাদের ১৭৭, নাখালপাড়া রোডে ওদের অফিসের বাজেট কমিটির খরচের বহর সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে। ৭০ হাজার টাকা। গ্রেফতার হওয়ার পর পান্ডা ইস্কান্দার আলির কাছ থেকে এসব জানা গিয়েছে। যারা ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতার কথা বলেছেন—তাঁরাই ওদের কোতলের তালিকায় উঠেছেন। ওদের চিন্তার ধারাই ইসলাম-বিরোধী— তাদের বেচে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। প্রগতিশীল বইপত্র খুঁজে খুঁজে বের করে বাজেয়াপ্ত করানো ওদের একটা বড় কাজ ছিল। আর ছিল, ঘট পাতা যায় এমন বয়সকে পুলিশে, শিক্ষকতায়, সাংবাদপত্রে ঢোকানো।

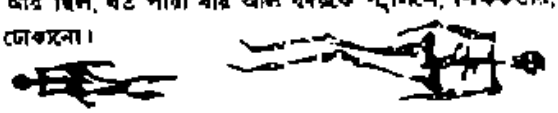

আল বদরের লোকজন মাঝরাত পেরিয়ে আসতো। বাড়ি বাড়ি ঢুকে যাকে পেত নিয়ে যেত। এদের শতকরা ৯২জন বাঙালী। নাটের গুরু দিওলানা মতিউর পশ্চিম পাকিস্তানী। বাংলাদেশে আল বদরের প্রধান- গোলাম আজম পতনের অনেক আগেই মক্কায় পাড়ি দেয়।

ওরা মিলিটারির সঙ্গে জিপগাড়িতে ঘুরে বেড়াতো। সাত মসজিদ রোডে কলেজ অব ফিজিক্যাল ইন্সটিট্যুশনের হেড কোয়ার্টারে ওরা বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে নিয়ে যেত। তারপর এম এল এ হস্টেল, বাবরমহীর হাইস্কুল, ক্যান্টনমেন্টের মসজিদে বন্দী শিবিরে তাদের চালান করে পাঠিয়ে দিত।

১ আগস্ট। ১৯৭১। ঢাকার প্রবাসালী মহল্লা মহম্মদপুরে গ্রাল বন্ধু পাড়ায় বৈঠকে বসে বুদ্ধিজীবী লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিকদের সাবাড় করার গুপ্ত লিস্ট তৈরি করল। পরে দৈনিক সম্পাদক আবদুল মালেক গ্রেফতার হলে আরও সব বন্ধু জমায়েত করে বেরোলো।

গুপ্ত লিস্টের চিফ ডিজাইনার: চলমানবাহী বাহিনী কমান্ডার মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি।

কয়েক মাস আগে ঢাকায় পদার্পণ করেন তিনি। এই দেশের লোকদের কবিদন আগে রাও সাহেব মেজর জেনারেল পদোন্নতি পেয়েছিলেন। তার সহায়ক ছিল পাক আর্মির ১০জন অফিসার। যাদেরকে নাম: ব্রিগেডিয়ার বাশির, ব্রিগেডিয়ার জামসুদ্দিন এবং কর্নেল মহম্মদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমানুল্লা, হিদায়েত এবং বিগ্রাদিয়ার কাশমীরি আইয়ুব, ওয়াহেদ, মমতাজুল হক চৌধুরী, হাফিজ এবং ওসমান, মেজর জহুর এবং আসলাম।

পুলিসের ভেতর থেকে দু'জন ডি এস পি ফরিদি এবং হাফিজ এদের সঙ্গে থাকত।

ঘন্টায় ঘন্টে ৩০০/৩৫০জন বাঙালী মানুষকে হৌত করে বাঙালীর মেরুদন্ড গুড়ো করে দেওয়া হচ্ছে—সেগুলো আমেরিকা থেকে মৃত্যু-সিগন্যাল আমদানী করা হয়েছিল। ইলেকট্রিক চেয়ারখানা ছিল মটুয়ারের সারকিট হাউসে। এরেই প্রতিভায় প্রথমত মানুষ নিধনের ডিকসনারিতে 'জেনোসাইডের' মত শব্দের পরেই আরেকটি কথা সৃষ্টি হয়েছে: 'এলিটোসাইড'।

ষোল ডিসেম্বর সারেন্ডারের ঘন্টা দুয়েকের ভেতর ঢাকায় শোনা গেল: মহম্মদপুরে ফিজিক্যাল ইন্সটিট্যুটে সতাবিক বাঙালী বুদ্ধিজীবী বন্দী। ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাও ছুটে গেলেন। একে একে উদ্ভাসীদের কুকীর্তি বেরিয়ে পড়ল। ১৪ ডিসেম্বর শেষরাতে আল বদরের মুখোশধারী লোকজন বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি হানা দেয়। ঢাকার টেরোস্টসিয়ন্ট রোড, যেখানে বুদ্ধিজীবীরা থাকতেন—সেখানকার আমীর—আসলে মৃত্যুকূপে সতাবিক ডেডবডি পাওয়া গেল। প্রত্যেকের চোখ উপড়নো, হাত পেছনে বাঁধা, নাক-কান কাটা।

মৃত অবস্থায় আবছা আবছা যাদের চেনা গেল: অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, অনোয়ার পাশা, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল হক, নিজামুদ্দিন, এস বি যাদুদ। চাক্ষুষ পাওয়া গেল, শহীদুল্লা কাইসার, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ মুনির চৌধুরী, ডঃ রাশিদ, ডঃ মুরতেজা, আলিম চৌধুরী এবং ইলিয়াস মাসুদকে।

কিছু মহিলার মৃতদেহও ছিল। একটি স্কুল হার চেয়ারে ঝুলন্ত। বুদ্ধিজীবী একজন মহিলাকে ওরা পাশ্চি চড়িয়ে বিয়ের কনে সাজিয়ে, সানাই বাজিয়ে লোকওয়েনে নিয়ে এসেছিল। সারারাত অভিযান চলে। তারপর উদ্ধারে—

সেই লোকওয়েনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগ উপাচার্য, ডঃ সিরাজুল হককে পাওয়া গেল। পাওয়া গেল অধ্যাপক মনিরুদ্দিন, হাফিজুল ইসলাম, সাংবাদিক মহম্মদ মোশাররফ, এস এ মান্নানকে। মৃতদের দেহ নিয়ে প্রতিটি শহরে ওরা একাত্ত অপেক্ষা। ছাত্র, যুবকরা পাগলের মত এদের খুঁজছে। নদীর চরে বালি খুঁড়ে খুঁড়ে কঙ্কাল তুলে তুলে মমতুর চেনার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে দিনরাত।

মুক্তির আর একটি দিন দেরি হলে অন্তত ৩০০০ বাঙালী মানুষকে ওরা সাবাড় করত। লিস্ট তৈরি ছিল। লেখক, শিল্পীদের সবার নাম ছিল। পনর ডিসেম্বর হাজার খানেক সরকারী কর্মচারীকে ঢাকার গভর্নর হাউসে ডাকা হয়েছিল। প্রশাসনের বাছাই লোকজনকে কোতল করে বাংলাদেশের ভাবী শাসনব্যবস্থা পঙ্গু করাই ছিল মতলব। শেষ অবধি খুনের এই ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিত্যক্ত হয়।

বদর বাহিনীর সর্বময় কর্তা রাও ফরমান আলি সরকারী কর্মচারী সাবাড়ের লোকটা ইন্ডিয়ান আর্মির ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল। সারেন্ডারের পর ঢাকার গভর্নর হাউসে জেনারেলের বিছানার একটি চিরকুট থেকে এ তথ্য ফাঁস হয়। বাঙালী বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উঁচুস্তর সরকারের চৌকস লোক ছিল। ঢাকার রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে মুক্তিবাহিনীর বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল এইচ কুদ্দুস বলেছিলেন: মোট ২৪০জন বুদ্ধিজীবীকে খুন করা হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর সারা বাংলাদেশে সারা দিনরাতে ফরমান আলি আর ব্রিগেডিয়ার বাশিরের নির্দেশে কর্নেল এজাজ আলি খানের সশস্ত্র খুনেদের নিয়ে বুদ্ধিজীবী শিকার করে বেড়িয়েছে। ঢাকায় খুন হয়েছেন: ১৪০জন, খুলনায় ৫০জন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫০জন। খুলনায় সারেন্ডারের আগেও কথাই-নাটক চালু ছিল।

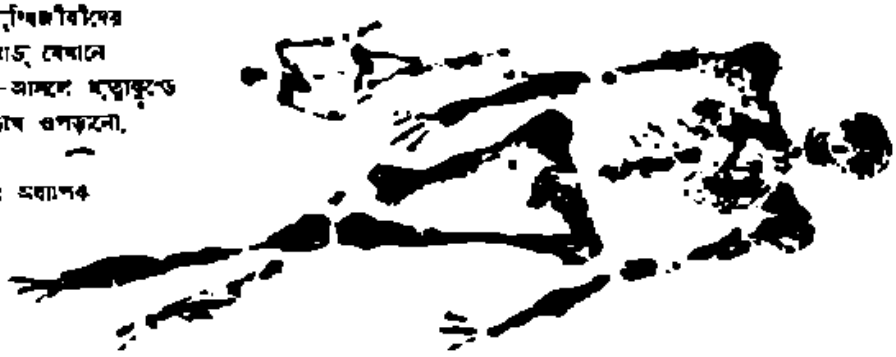

৮

সোনার বাংলা ২৯২ দিন বাদে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১০ জানুয়ারি। লন্ডনের হীথরো বিমানবন্দরে। লন্ডন থেকে ঢাকা হয়ে সিমলা যাবেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি ভুট্টোর উদ্যোগে আয়োজিত শ্রীমতী গান্ধী, রাষ্ট্রপতি ভি'ভরিন সঙ্গে শেখ মুজিবও রয়েছেন। তাঁর বাঁ দিকে প্রেসিডেন্টের পেছনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ।

রাষ্ট্রদূতদের কণ্ঠে মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার দাবি উচ্চারিত হলো। আসলে কিন্তু ১০ তারিখই মুজিবের ফাঁসির আদেশ হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধী নিকসনকে লিখলেন, প্রভাব খাটিয়ে আমেরিকা যদি মুজিবকে মুক্ত করতো তাহলে যুদ্ধ হত না। ওয়াশিংটন তখনো বলে চলেছে, পূর্ববঙ্গ থেকে এখনই ভারতীয় সৈন্য সরে যাক। লিঙ্কনের চু বললেন, ঢাকা জয় ভারতের পরাজয়েরই সূচনা। পাকিস্তানের পিছনে দুনিয়ার শান্তিকামীরা আছে।

ঢাকার অফিস কাছারি খুলে গেছে। ওদিকে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সারা পশ্চিম পাকিস্তান উত্তাল। ভুট্টোকে দেশে ফেরার জন্যে ওয়াশিংটনে জরুরী তলব পাঠানো হল।

তারপরই ইয়াহিয়া পলাতক। ভুট্টো বন্দিতে উচ্চারিত হলেন। লারকোট নুরুল আমিন বলতে বাধা হলেন, মুজিবকে জেলে রাখা যুক্তিযুক্ত। ২১ ডিসেম্বর ভুট্টো নিজেই বললেন, মুজিবকে অন্তরীণ রাখা হবে। তবে মুক্তি দেব কি না—জনমত নিয়ে ঠিক করব।

তাজুদ্দিন মন্ত্রিসভা ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় নিয়ে গেলেন। শেখ সাহেবের সবচেয়ে ছোট ছেলে রাসেল বলল, আব্বা যাবার দিন তাকে বলে গিয়েছেন। আব্বা আমি যাই। রাসেলের বিশ্বাস—আব্বা ফিরে আসবে।

ভুট্টো মুজিবকে কয়েদখানা থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করলেন। মিয়াওয়ালি জেল থেকে মুক্ত করে মুজিবকে প্রথমে ইসলামাবাদ—তারপর পিনডিতে নিয়ে যাওয়া হল।

ভুট্টো তাঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। প্রেসিডেন্টের বাড়ির লাগোয়া বাড়িতে তখন বন্দিবন্ধুকে রাখা হয়েছে। পিনডির তা-বড় তা-বড় সরকারী আমলারাও তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। কি এত কথা! মুক্তি না দিয়ে পথ কোথায়?

২৮ ডিসেম্বর ভুট্টো বেশ নাটকীয়ভাবে সাংবাদিকদের বললেন, এইমাত্র মুজিবের সঙ্গে কথা বলে এলাম। নিরাশ হইনি। ভুট্টোর এই টেলিফোনার ছোঁয়ায় ঢাকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম মুক্তিসনদ করে দিয়ে বললেন, আমাদের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে এখুনি মুক্তি দাও ভুট্টো।

করাচির জল, জলের মত কালরাও পরিষ্কার বলল: মুজিবকে মুক্তি দাও।

শেখ মুজিবুর রহমান সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে উচ্চারিত নাম। বাংলাদেশের বাঙালীর কাছে তিনি যে কি, তা এক কথায় বলা যায় না। ঢাকার জনসভায় কর্নেলের স্ত্রী খানিকটা বলতে পেরেছিলেন।

•মুজিব বাংলাদেশের সমান।

তেসরা জানুয়ারি, উনিশশো বাহাত্তর। জনসমাবেশের সামনে ভুট্টো প্রশ্ন রাখলেন,

বাংলার হিন্দু
বাংলার খৃষ্টান
বাংলার বৌদ্ধ
বাংলার মুসলমান
আমরা সবাই
বাঙালী

"দেরী কোরো না"

পঁচেরোল বিকেলে প্রথম ফোনেরোম হয়েছিল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে। সাংবাদিক সম্মেলন সবাইকে সর্বাধিক সকালে হাজির থাকতে বলেছিলেন। এর আগে কোনদিন আসেননি। হাঁটতে হাঁটতে বলেছিলেন। ১৮ নম্বরে ফোন করেন। ফোন করে বলেছিলেন, আর এখানে না। কারণ ওঁদেরকে খানিকক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে যেতে হবে। ওঁরা চেয়ারম্যানের মধ্যেই চলে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাই বলে—আবার ফোন করে এখানে এসেছিলেন। বাড়িতে তখন কেউ নেই। ফিরেছেনের সকালে ঘরে ফোন সারাক্ষণ ডাকাডাকি করেছিল। কেউ এখানে ফোন না। সেই ঘটনার পরদিন বিকালে বাড়ির ছাদে আমি উঠেছিলাম শুধু আমার মনের মধ্যে বারবার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন এক কি সন্দেহ আমার মনে হচ্ছিল। ওরা কি সত্যিকারের কেউ আছে না? কারণ ই, বি মার্শাল—নিরাপত্তার কড়া কথাগুলো আমাদের বলে গেছে।

সকলবাদ, কন্যাকারি ফোনের রেজিস্ট্রেশনের ফোন তাদেরকে দেখান। তখন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ছুটে এলেন। কিন্তু কেউ ফোনকারকে দেখতে পায় না। অনেক খুঁজেও খুঁজিয়ে ফোন তার কথা নিজের করলেন। তারপরে তাদেরকে তাদেরকে পোঁছিয়ে দিয়েছে।

ঘিঞ্জিতে আসতে বললেন। তাদেরকে গ্রহণ করলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার নিউজরুম থেকে ফোন করলেন প্রমিতাভ চৌধুরী। দুনিয়ার সাংবাদিকদের মধ্যে দুঁজির পর দুঁজিবের সঙ্গে প্রথম কথা বললেন। আনন্দবাজারের পক্ষ থেকে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাই।

ওপার থেকে পরিষ্কার ভেসে গলা ভেসে এল, আমার প্রেস স্টেটমেন্ট পেয়েছেন?

সন্ধ্যা জানুয়ারির সকালে দুঁজির ঘিঞ্জিতে নামলেন। তখন আসছেন—নিরাপত্তার খাতিরে তা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় দুঁদেশের পতাকা পাশাপাশি উড়ছে। পোস্টারে লেখা—বন্ধু-পন্থা সেরা ছাত্র ইন্দিরা-বাংলাদেশ সেরা দুজন

এই মানুষটিরই অনেকখানার সামনে তাঁরই জন্যে অপেক্ষায় ছবের ছোঁড়া হয়েছিল মাত্র কয়দিন আগে। ঘিঞ্জির সমাবেশে তিনি ইংরাজিতে শুরু করেছিলেন। সবাই বলল, বাংলায় বলুন। মাইকে ভেসে এল সেই কণ্ঠ—সেই আবেগ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আপনাদের মহান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শুধু মহান ভারতের নেতা নন—সমস্ত মানবজাতির নেতা।

তারপর ঢাকার জনতার সেই ঐতিহাসিক রেসকোরাস্ ময়দান। সময় অপরাহ্ণ। নির্বাচনে আওয়ামী লিগের প্রতীক ছিল নৌকো। সেই আদলে নৌকোর ওপর পাঁচশো ফুট দীর্ঘ মঞ্চ তৈরি

হয়েছে। সেখান থেকেই তিনি জনগণকে বাংলার চূড়ান্ত নির্দেশ আলোচিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, আমি প্রথম স্মরণ করি বাংলাদেশের যে সন্তানদের উপর অত্যাচার হয়েছে তাদের। জানতাম বাংলাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। কত লোক শহীদ হয়েছেন, জান দিয়েছেন, তবু পিছু হটেন নাই।
৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলা হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত লোক এত নারীর সতীত্বনাশ করেন নাই, শহীদ হন নাই।
আজ থেকে আমার হুকুম—প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, তাই হিসাবে—তোমরা আমার ভাই। আমাদের এ স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়, গা ঢাকা কাপড় না পায়—যুবকরা কাজ না পায়। (করতালি)।
আপনারা আমাকে চেয়েছেন, আমি এসেছি। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কবর খোঁড়া হয়েছিল। জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।
আমার আগে ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, দেখুন দুই গ্রুপে কোন বাঁধন রাখা যদি সম্ভব হয়। আমি বলেছি, ভুট্টো সাহেব, তোমরা সুখে থাকো, কিন্তু বাঁধন টুটে গেছে।
মুবারকবাদ জানাই চায়নের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, চায়নের জনগণকে।
চায়ত বাংলাদেশ ভাই ভাই। শহীদের স্মৃতি অমর হোক। জয়বাংলা।

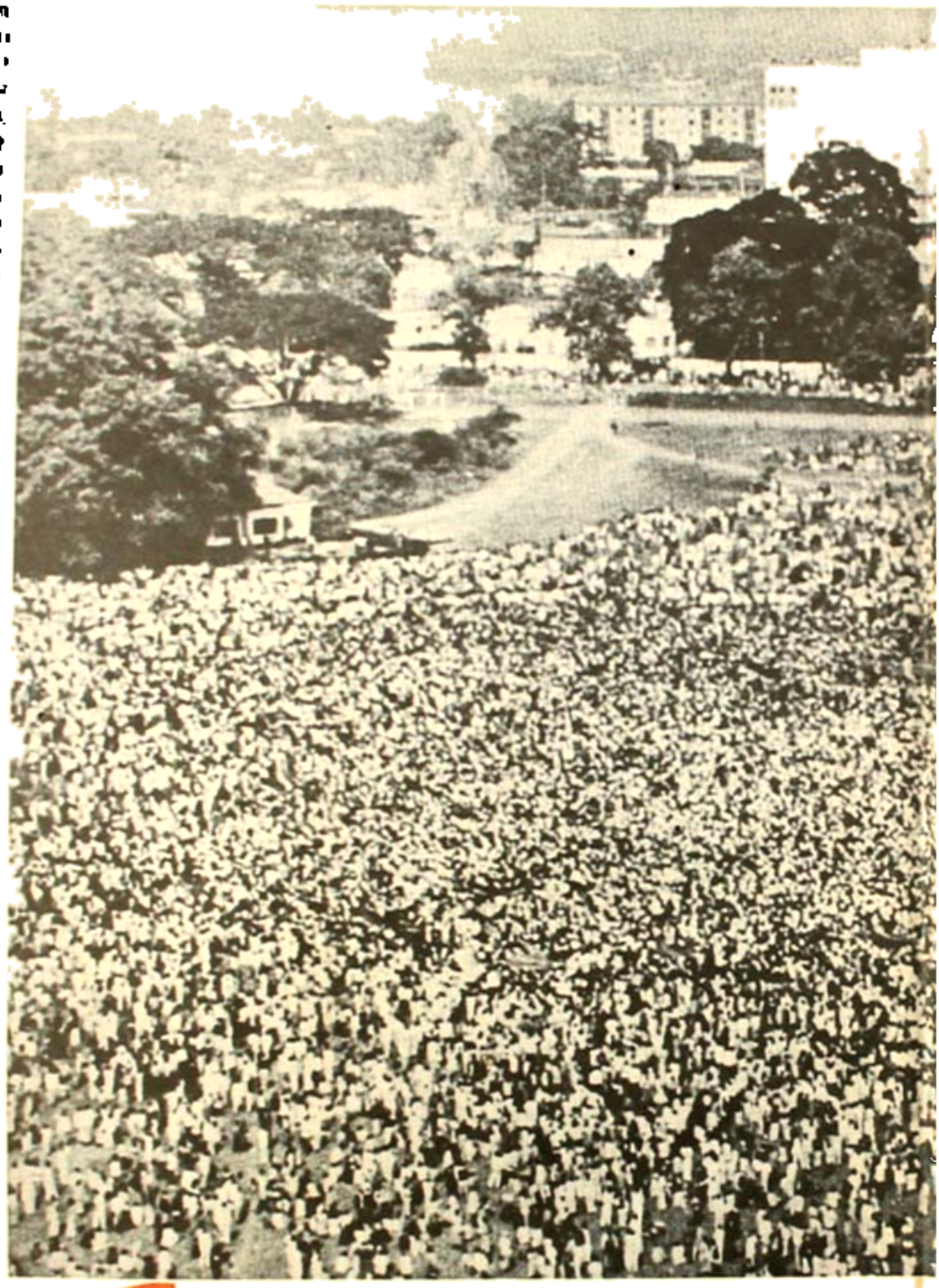

...আমি জানতাম না আমার বাবা-মায়ের মধ্যে কিসে আমাকে পড়ায়। আমি এসে বলেছিলাম, ছেলের আমাকে মানুষ চাই, ছেলে নেবো।

শুধু আমার মাসী বুঝতেন আমার বাড়ানটির ওপর কিসিয়ে দিও।...

—আপনার আমাকে ছেড়েছেন, আমি এসেছি। আমার জীবন নতুন হয়েছিল। কথা শেষ হয়েছিল। জীবন যেমন অন্ধকার-পুলকুর হয়েই ছিলাম।

বলেছিলাম, আমি অভাগী, আমি অসুখ, আমি অপেক্ষার, মানুষ একমাত্রই হয়,

মনের মাইন ঘটি হয়ে সেই খবর ছেলে এল।

ছেলেরা যেমন আছে?

অনেক লম্বা কিছুই বলতে পারলেন না। তারপর বেশ দুঃখিত হলেন, যেতে আছি। তুমি যেমন আছ? তাড়াতাড়ি চলে এল। যেমি কেমন না। সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বেশ দুঃখিত ফোন রেখলেন। বাড়ির সামনে হাজার হাজার মানুষ তখন উৎসবে কোলাহলে করছেন। তিনি জানেন, আমি এই খবর পৌঁছাই।

হাসিমুখে তাঁর বাবা ফোনে বললেন, হাসিনা, তোমার ছেলের কি এসে যেতে?

হয়।

প্রথম কথা হয় বড় ছেলে তাহমিদের সঙ্গে। তাহমিদ বললেন, আব্বার সেই খবর পেলাম পর আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি।

আব্বা বললেন, তোমরা যেতে আসিস তো?

আমরা সবাই বলো। তুমি যেমন আছ এখন আসবেন? তাড়াতাড়ি আসবেন।

বেশ দুঃখিত পরে বললেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন—ছেলেরা কি চাকরি করে? তিনি এই ছাত্র বৃদ্ধ বয়সে ৯০ বছরের বৃদ্ধের বয়সের মানুষকে ছেলের খবর দিলেন। বৃদ্ধ যা বলার চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে। বৃদ্ধের আমাদের আসার টুইস, পরে তাই তাঁরও পালটা খবর—বাহতে আসব আমরা। বন্ধুবান্ধবে যা বলবেন তাই জানবে, তাদের নিয়ে, পরদিন তাঁরিখাড় খবর ছড়ায় পড়ি।

বিদেশীদের প্রশ্নের জবাবে শেষ বৃদ্ধের বললেন, আমি যেমনকে দেখি। এখন কিছু বলব না। তাঁর মন আমাই আমার পাশে। তাহমিদের মন ভরিবে। আমার ছেলেমেয়ে থেকে বাংলাদেশের খাঁটি চুমেলা। দুঃখিত নয়া মন্ত্র আমার ছুটে নিয়ে ভরিয়ে বলল। দুজনের চোখেই জল।

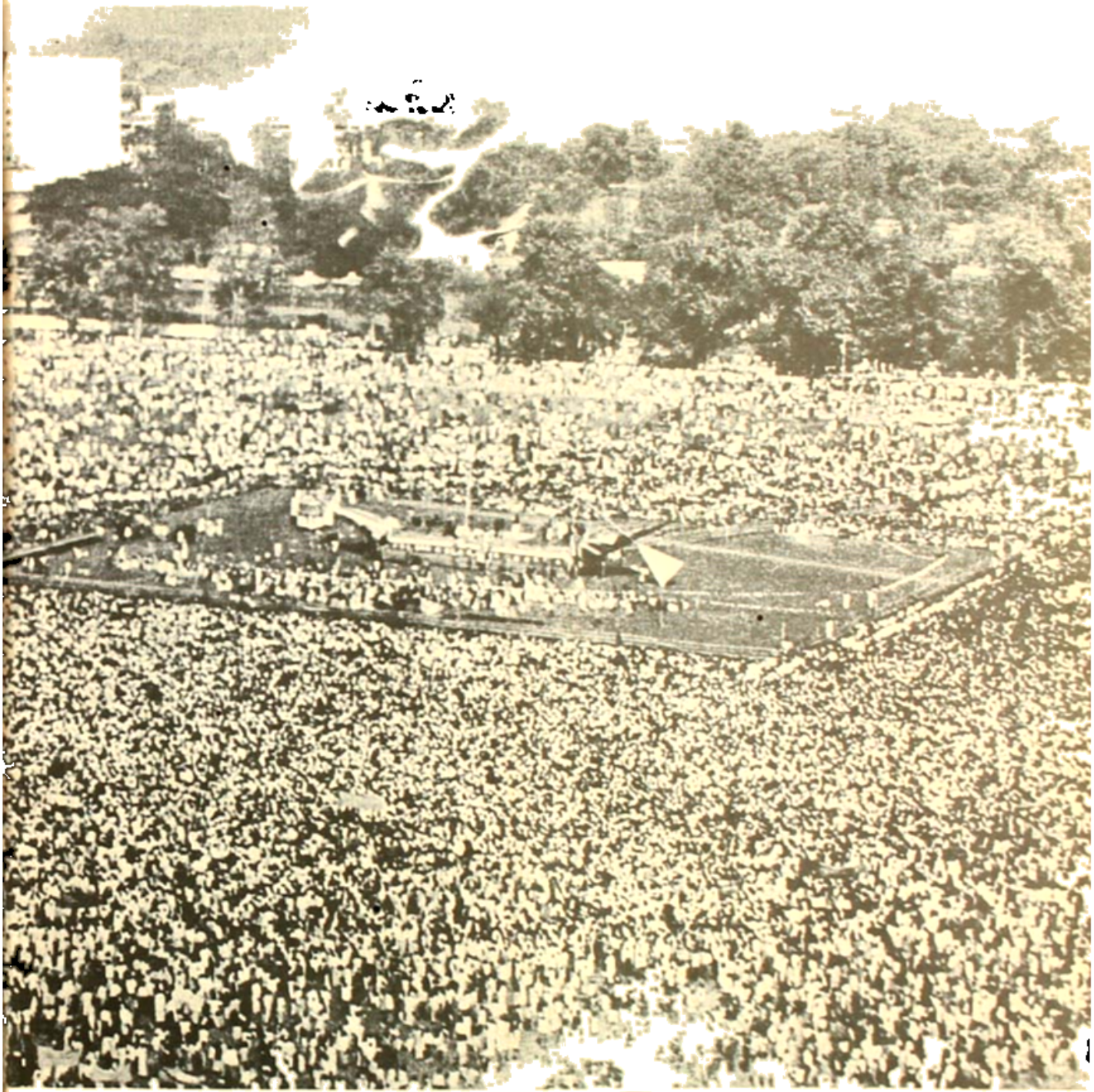

ধুয়ো নই। হাসতে হাসতে মরব, তবু, কেঁদে কেঁদে বাঁচা চাইব না।
বয়স বাড়লেও বলে যাব, আমি কাঙালী, বাংলা আমার মাতা, বড় বাংলা,
কলম বাগানের মাটি আমার মা। আমি মাথা নত করব না।...
শেষের আমি বলতে পারছি না। কেন যেন এত সুন্দরী মা ঈশ্বরী তুল্যভূমি।
সেই জন্মভূমির মাটিতে পা দিয়ে আমি চোখের পানি ফেলতে পারি নাই।
ভালবাসা না, এই মাটিকে, এই জাতিকে এর অহংবাসি।

এলেন। তাঁরও চোখে জল।
এক তিনজন হাঁটতে হাঁটতে মোহনা
ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।
দরজায় দাঁড়াতে ঘরে পর ঘরে
তাঁদের খবরদার মুক্তিরা। সবার
চোখে জল। একসময় তিনি বেরুন
জনসভামঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন।
বেরুন সঙ্গে সঙ্গে গভীর শান্তিস্তব্ধতা
আরও ঘুরে মাথা ঝাঁকালেন।
ছোট্ট উচ্চারণ চীৎকার করে।
কিন্তু, কেন বলতে শুরু করেই জনতার
মধ্যে পড়লেন। তাঁকেও অনেক জনতে
জন ফিরে এল। তখন মাইকটির
চুপিসারে পর চুপিসার কিছু
খেতে চাইলেন।

MENDED
IN 2007